কল্যাণ

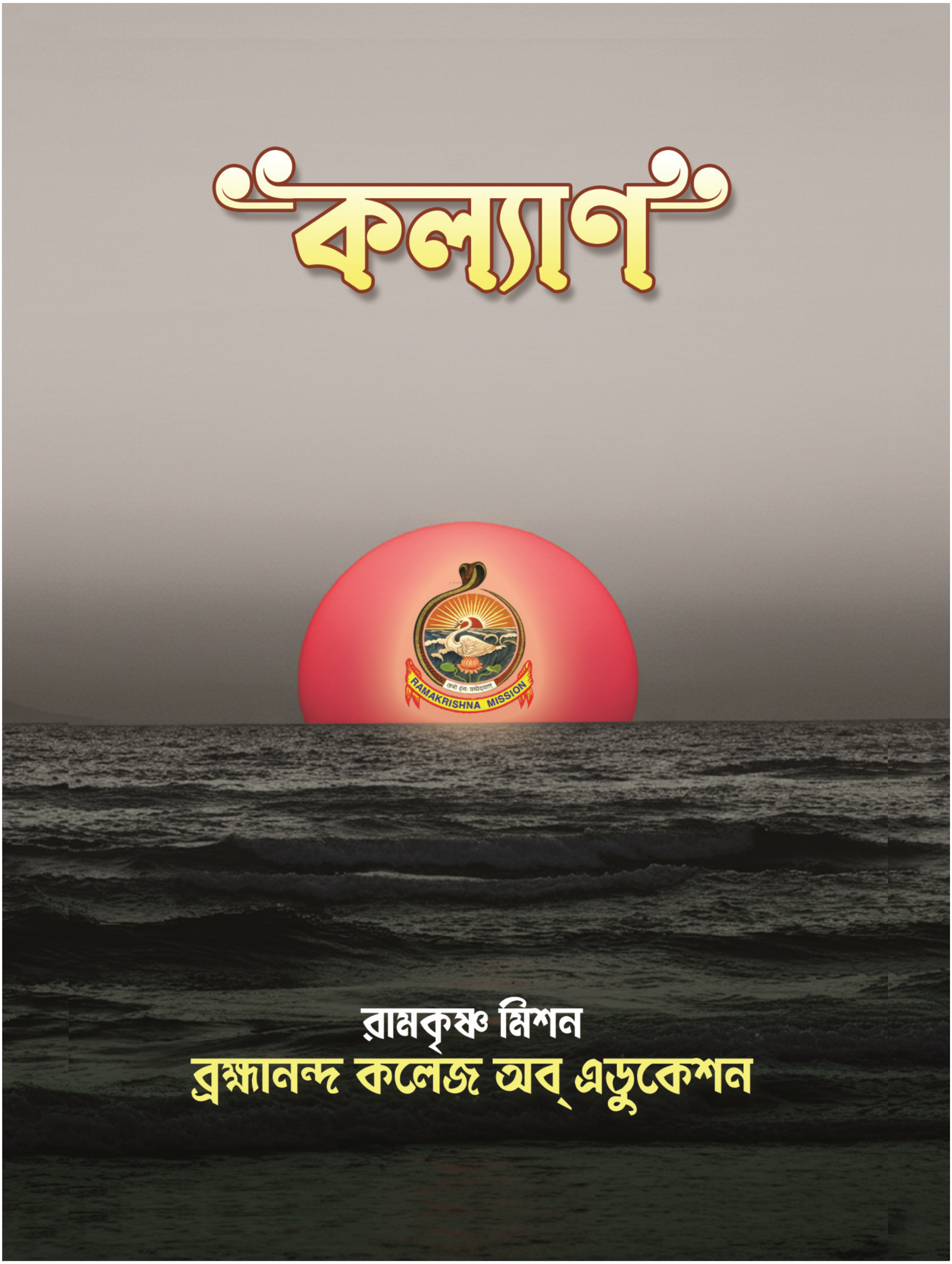

রামকৃষ্ণ মিশন
ব্রহ্মানন্দ কলেজ অব্ এডুকেশন

কল্যাণ

রামকৃষ্ণ মিশন
ব্রহ্মানন্দ কলেজ অব্ এডুকেশন

রহড়া, কলকাতা - ৭০০ ১১৮

প্রকাশন সংখ্যা ঃ ৬২ **শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০২৫**

প্রধান উপদেষ্টা

অধ্যক্ষ, স্বামী নিরীশানন্দ

পত্রিকা সম্পাদক

অধ্যাপক, ড. কৌশিক চট্টোপাধ্যায়

পত্রিকা উপসমিতির শিক্ষক সদস্য ঃ—

অধ্যাপক, ড. মলয়েন্দু দিন্দা

অধ্যাপক, ড. সঞ্জয় মিত্র

শিক্ষার্থী সদস্য ঃ—

শ্রী কৃষ্ণাশিস দাশগুপ্ত

শ্রী দেবোত্তম দাস

প্রকাশ	ঃ	ডিসেম্বর, ২০২৫
প্রকাশক	ঃ	স্বামী জয়ানন্দ সচিব, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা	ঃ	স্বামী নিরীশানন্দ (অধ্যক্ষ)
মুদ্রণ	ঃ	রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, অফসেট প্রিন্টিং প্রেস দূরভাষ ঃ ২৫৬৮-২৮৫০, ৩২১৯

কার্য নির্বাহক উপসমিতি ঃ ২০২৫

সভাপতি	ঃ	স্বামী নিরীশানন্দ, অধ্যক্ষ
শিক্ষক-সংসদ সম্পাদক	ঃ	ড. সুব্রত বিশ্বাস

—ঃ উপসমিতির আহ্বায়কবৃন্দ ঃ—

সাংস্কৃতিক কার্যাবলি	ঃ	ড. কৌশিক চট্টোপাধ্যায়
ভর্তি, পরীক্ষা, সময় নির্ঘণ্ট ও রেকর্ড	ঃ	ড. সঞ্জয় মিত্র, শ্রী শুভজিৎ চক্রবর্তী

—ঃ ছাত্রাবাস সমিতি ঃ—

চেয়ারম্যান	ঃ	অধ্যক্ষ
সদস্য	ঃ	ছাত্রাবাস সুপারিন্টেন্ডেন্ট, হোস্টেল প্রিফেক্ট

RAMAKRISHNA MISSION BOYS' HOME

P.O. Rahara, Kolkata - 700 118 (West Bengal), INDIA

Phone : [STD – 033] 2568-2850 & 3219, Secy.–2523-6116 & 7666 [d]

[A Branch Centre of Ramakrishna Mission, Belur Math, Howrah-711202]

ডিসেম্বর, ২০২৫

শুভেচ্ছা

উজ্জ্বল ঐতিহ্যের ধারায় প্রকাশিত হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন ব্রহ্মানন্দ কলেজ অব্ এডুকেশনের মনন চর্চার বার্ষিক পত্রিকা কল্যাণ-এর ৬২তম সংখ্যা।

আজ মানুষ গড়ার শিক্ষা বড্ড প্রাসঙ্গিক, আদর্শ শিক্ষকই আশা-ভরসার স্থল এবং দৃঢ়তার প্রতীক। শিক্ষকদের সৃজনী ভাবনার প্রবাহ সমাজকে সার্থকতা দিতে পারে। 'কল্যাণ' তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। সার্থক হোক এর প্রকাশ। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা জানাই।

সম্পাদক

সূচিপত্র

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
পত্রিকা সম্পাদকের কলমে	ড. কৌশিক চট্টোপাধ্যায় (অধ্যাপক)	৬
বিবেকানন্দ	স্বামী নিরীশানন্দ (অধ্যক্ষ)	৭
নবীন প্রজন্মের কাছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা	মনতোষ মিস্ত্রী	৯
পুণ্যতীর্থ গঙ্গাসাগর	চয়ন মাইতি	১১
অজানা সরস্বতী	সুমিত কুমার দাস	১৪
ঠাকুর নগরের মেলা	রাজকুমার মজুমদার	১৬
সন্ধান	ধীরাজ সেন	২০
রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত ছোটোগল্পে জীবন-জীবিকা প্রসঙ্গ : একটি পর্যালোচনা	মধুসূদন সিং সর্দার	২১
মায়াতরী	রোহন দাস	৩৩
গোরাচাঁদ	কৌস্তভ ঘোষ	৩৬
শেষ সন্ধান	রাজকুমার মণ্ডল	৩৭
রুদ্ধশ্বাস নর্থ সিকিম	সুরজিৎ সাহা	৪১
ভোরের আলো	ধীরাজ সেন	৫০
শান্তি বোমা	দেবোত্তম দাস	৫১
মুক্তিযোদ্ধা	অনন্ত দাস	৬২
ক্ষণিক জীবন	শোয়েব মণ্ডল	৬৩
তারকেশ্বর	সৌম্যজিৎ মণ্ডল	৬৪
বাহা উৎসব : এক সুন্দর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	সুরেশ মণ্ডল	৬৬
বিহু-উৎসব আসামের গৌরব	প্রীতম সাহা	৬৮
মা-বাবাকে ভুলে যেও না	তুফানচন্দ্র দাস	৭১
বিদ্যাসাগর ও বাঙালি আধুনিকতা	ড. কৌশিক চট্টোপাধ্যায় (অধ্যাপক)	৭২
বসন্ত স্বাগতম	শোয়েব মণ্ডল	৭৮
মহাত্মা গান্ধী : প্রমথ চৌধুরীর চোখে	মলয়েন্দু দিন্দা (অধ্যাপক)	৭৯

Subjects	Writter	Page
The Four Noble Truths : A Pathway to Overcoming and Understanding Suffering (by Buddha)	Akash Barua	91
The Role of Education to Empower Transgender People in West Bengal	Shoaib Mondal	96
Why do I prefer gender justice to gender equality ?	Md. Masihur Rahman Ansari	102
Dramatic Passage of Time	Krishnasish Dasgupta	105
Shaping Minds in the Digital Era : The Dual Impact of Modern Technology on Students and Education	Sabyasachi Sharma	107
Reminiscence of Yellow Flowers	Gairik Misra	113
The Educational Disparity between Rural & Urban Areas in West Bengal : Current Situation and How Unemployment Shapes Public Perception of Education	Ariful Gazi	116
A Symphony of Flavors : The Story of Biryani	Atique Ejaz	120
The Present Governing Body of the College		122
Our Faculties		123
List of B.Ed. Students for the Session : 2024-26		124

সম্পাদকীয়

বাঙালি শিল্পীর কণ্ঠে একদিন উৎসবের মতো বেজেছিল বর্ষার গান, থৈ থৈ শাওন এলো ওই.... পথহারা বৈরাগী রে তোর একতারা টা কই! সেদিনও ঝরেছিল শ্রাবণের অঝোর ধারা সাঁঝ। সন্ধ্যার অঝোর আঁধারে জোনাকি জ্বলেছিল পাড়ায় পাড়ায়। বন্দনা ভাষ্যে বিশ্বকবি গাইলেন, 'বাদল বাউল বাজায় বাজায় বাজায় রে, বাজায় রে একতারা...।' শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারাপাতে সেদিন প্রিয় কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন গ্রামবাউলের একতারার মিঠে সুর। আমরা বাঙালিরা এমনিই আবেগের মানুষ। বাঙালি জীবনের সঙ্গো প্রকৃতির এমনিই নিবিড় যোগ। রবীন্দ্র দীক্ষায় প্রকৃতির রূপ রস বর্ণ গন্ধের অনুভব আমাদের শিরায় শিরায়। আজও। আজও বৃষ্টি হচ্ছে একই রকম। এই সম্পাদকীয় যখন লেখা হচ্ছে তখন বর্ষা নেমেছে অবিরাম ধারায়। দিগন্ত ছেঁড়া আকাশ জুড়ে বৃষ্টিভেজা নিকষ কালো মেঘ। সন্ধ্যে নামলেই এখনও ইতিউতি ব্যাঙের সমস্বর ডাক অস্পষ্ট ভাবে জানান দেয় তাদের প্রাগৈতিহাসিক অস্তিত্বের কথা। এখনও রাস্তায় জল জমে। ছাতা মাথায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে কাজ পৃথিবীর মানুষ। তারই মাঝে রথের উৎসবে জনপ্লাবন বয়ে যায় জায়গায় জায়গায়। জনপ্লাবন বয়ে যায় মাহেশে, পুরীতে। এ বছর বাঙালি জীবনে নতুন ভাবে সংযোজিত হয়েছে সরকারের প্রচেষ্টায় দীঘায় নবপ্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ মন্দিরের রথ। বর্ষা আছে, উৎসব আছে, মানুষের ভিড়ও আছে। কিন্তু এ কোন মানুষ! কোন আনন্দের বহিঃপ্রকাশ! ভোগের অগ্নিদাহনে এ কোন ভালো থাকা! চাপা উদবেগ আর মোচড়ানো যন্ত্রণার উপর প্রসাধনী প্রলেপে ঢেকে রাখা হতাশা, নৈরাশ্য, ক্ষত আর অজস্র কদর্যতা। লোকশিল্পীর কণ্ঠে তেমন করে বাজে কি জীবনের গান? ভরসা হারিয়েছেন তাঁরা। মুখ লুকিয়েছেন সেই সব জীবন শিল্পীর দল। আপাত আলোর মধ্যেই অদ্ভুত আঁধার এখন। ঘন বর্ষার গুমোট জলো হাওয়ায় শোনা যাচ্ছে সদ্য চাকরিহারা নির্দোষ প্রজন্মের হাহাকার। তাদের নিষ্পেষিত যন্ত্রণার কান্না। ছাব্বিশ হাজার পরিবার চাকরি হারিয়ে স্তম্ভিত চোখে গাল পাড়ছে সভ্যতাকে। কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে আরক্তিম চোখে তীব্র স্বরে গাল পাড়ছে অদৃষ্টকে। স্বপ্নের রাজ্যে, স্বপ্নের দেশে ভয়ে কাঁপছে একুশ শতকের মেয়ে। একুশ শতকের আতঙ্কিত মা। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় যে কোনো মুহূর্তে দিনে রাতে পথে ঘাটে হস্পিট্যালে বিদ্যালয়ে কলেজে কারখানায় পুরুষ খাদকের উন্মত্ত লালসার বলি হয়ে যেতে পারে তারা। এক শ্রেণির ক্ষমতাবান, ক্ষমতায় বলপুষ্ট দলপুষ্ট পুরুষ, প্রশাসক পুরুষ, ডাক্তার পুরুষ, শিক্ষক পুরুষ, নরখাদক পুরুষ যেন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে চরিতার্থ করছে জিঘাংসা আর রিরংসার তেজ। একের পর এক। বিরতিহীন। জীবনের গৌরব অলংকৃত হচ্ছে ধর্ষণে। ধর্ষণ মায়ের ধর্ষণ সভ্যতার। ধর্ষণ জীবনের। ধর্ষণ নিরাপত্তার। ভরসা নেই কোথাও। সব প্রতিবাদ ভোঁতা হয়ে গেছে। ফেসবুক বিপ্লবে মুখ লুকিয়েছে স্বপ্নে পাওয়া আঠারো বছরের তরুণের যাবতীয় প্রতিশ্রুতি। রবীন্দ্রনাথের বাংলা, বিবেকানন্দের বাংলা, নেতাজীর বাংলা সর্বত্র শুধু হতাশা হতাশা আর হতাশা। শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ জুড়ে ধোঁয়াশা। অসহায় বাবা মায়ের জিজ্ঞাসু চোখের সামনে নিস্তব্ধ একটা নির্ভরযোগ্য উত্তর। এম এ, এম এস সি পাশ করে অগত্যা বি.এড পড়তে আসা ছেলে মেয়েদের চোখ থেকে ক্রমাগত উধাও হয়ে যাচ্ছে যাবতীয় বিশ্বাস। আশ্বাস। কোনো রকম বেঁচে যাওয়ার জন্য একটা যে কোনো চাকরির জন্যই যেন প্রাণান্তকর প্রতীক্ষা তাদের। সত্যিই এ বড়ো দুঃসময় এখন। তবুও জীবনের ফিনিক্স পাখিটা উঠে দাঁড়ায় আবার। বাঁচার জন্য আবার নতুন কোনো ইন্ধনের আকাঙ্ক্ষী হয় প্রজন্ম। তারা পড়াশোনা করে, তৈরি করতে থাকে নিজেদের। এর মধ্যেই 'কল্যাণ' পত্রিকার জন্য কবিতা গল্প প্রবন্ধ লেখে। সময়কাল নিয়ে খুব একটা উৎসাহ দেখানোর তাগিদ হারিয়েছে তারা। তবু লেখে। আমাদের বার্ষিক পত্রিকা "কল্যাণ" তারই দলিল। তাদেরই দলিল। এবছরের এই নিবেদন সবার ভালোবাসায় পঠিত হোক। পথ চলুক। ঠাকুর-মা-স্বামীজীর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক আমাদের সবার উপর।

ড. কৌশিক চট্টোপাধ্যায়
পত্রিকা সম্পাদক

বিবেকানন্দ

ধরণী ডুবাল দেখে অবিদ্যা অজ্ঞান।
আবির্ভূত মহেশ্বর ত্যাজি মহাধ্যান।।

কোটি সূর্যতেজঃপ্রভায় দূর হল যত কালো।
সত্য-প্রকাশ রুদ্ধ করে এ সাধ্য কার বলো?

বাজলো তুরি-দামামা-ভেরি, হো হো পড়ে গেল রব।
বনের বেদান্ত ঘরে পৌঁছালো, সজীব হল মৃত মানব।।

তাণ্ডব নৃত্যে দানব দলন, ত্রিভুবনে হুহুঙ্কার।
সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা পেল, ধর্ম হল সার।।

পৌরুষ সিংহত্বে আজ ক্লীবতার হল নাশ।
শৌর্য-বীর্যের মৃদঙ্গ তালেতে ছিন্ন অষ্টপাশ।।

ঘণ্টা নিনাদে ব্যাপ্ত ভুবন, ভাঙলো মোহ কারা।
জড় কিছু নয়, সব চৈতন্যস্বরূপ - জানলো বিশ্বসারা।।

রুদ্রাবতারে অসুর নিধন ক্ষমাহীন আক্রমণে।
ভৈরবের সত্তাপ্রকাশ মান-হুঁশের মনে।।

মূর্তিমান বৈরাগ্য যেন জ্বলন্ত হুতাশন।
গাণ্ডীবের টংকারে যত পাপ বিনাশন।।

'মাভৈঃ' মন্ত্রে সাহস এল, ভীরুতা গেল চলে।
মানুষ হওয়ার আহ্বানেতে বিশ্বভুবন দোলে।।

জ্ঞান অসিতে ছিন্ন হল অজ্ঞানতার ঘোর।
ক্ষমার মাঝে শান্তিসুধা প্রেম পরম নির্ভর।।

জগত আবার শুনলো সে বাণী, ‘ভোগে নয়, ত্যাগেই অমৃতি’।
কৃপাকটাক্ষে ধন্য মানব পেয়ে ভক্তি, মুক্তি॥

‘মৃত্যু’ বিনাশ নয়, অমৃতের দ্বার।
শমনভয় জয় হয় বিবেক-সেনার॥

যতিরাজের আবির্ভাবে সর্বজীবের হর্ষ।
‘শিবজ্ঞানে জীবসেবা’ যতি-সংঘের আদর্শ॥

দয়া, প্রেম মূর্ত হল বিবেকানন্দরূপী বুদ্ধে।
সে মহান ত্যাগ অনুভূত হয় বিশেষ চিত্তশুদ্ধে॥

জ্যোতির তনয় জ্যোতির্ময় জ্যোতিতে পূর্ণ ধরা।
জয়ী হল ভারতভূমি পুণ্য আশিসে ভরা॥

তিনি সেই আদি কবি, সৃষ্টি করেন বিশ্ব-সংসার।
খেলতে আপন সনে এক থেকে বহুত্বে তাঁর বিস্তার॥

সর্বজীবে তাঁর অধিষ্ঠান, বিবেক আনন্দ রূপে।
অশরীরী বাণী রুধির জাগায় আজও পাষাণ স্তূপে॥

মূর্তিমান সত্য তিনি শক্তির অবতার।
শক্তিই জীবন, দুর্বলের নাহিকো উদ্ধার॥

মানবের রূপে সে মহামানব, দুর্বলের বল তিনি।
নিখিল জীবের আত্মা যিনি একাক্ষর অন্তর্যামী॥

রামকৃষ্ণাধার তিনি যথা শেষনাগ।
মহাবীর স্বামীজীতে হোক অনুরাগ॥

— **স্বামী নিরীশানন্দ**
অধ্যক্ষ

নবীন প্রজন্মের কাছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা

মনতোষ মিস্ত্রী (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

১৮৩৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি কলকাতা থেকে ৯৭ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে কামারপুকুর গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয়। তাঁর বাবা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও মা চন্দ্রমণি দেবী তাঁদের ভক্তিনিষ্ঠা ও সত্যপরায়ণতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। আর্থিক সচ্ছলতা তাঁদের ছিল না। শ্রীহরির আশীর্বাদে জন্ম বলে তাঁরা এই শিশুটির নাম রাখেন গদাধর। গ্রামের সবার প্রিয় ছিল গদাধর। অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ ছিল নজরে পড়ার মতো, সাংসারিক কাজকর্ম বা রোজগেরে লেখাপড়ায় তাঁর মন ছিল না। বাকি ছেলেদের মতো গতানুগতিক লেখাপড়া না করে গদাধর নিজের মতো করে পড়াশোনা করতেন। তবে তিনি খুব সুন্দর গান গাইতে পারতেন; এছাড়াও ছবি আঁকা আর মূর্তি গড়াতেও তিনি পটু ছিলেন। গদাধরের প্রিয় কাজ ছিল সাধুসঙ্গ করা। গ্রামে যখনই কোনো সাধুসন্ত আসতেন, গদাধর তাঁদের সঙ্গে গিয়ে কথা বলতেন এবং তিনি প্রায়ই আপন ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন। ঊনবিংশ শতকের এক প্রখ্যাত ভারতীয় বাঙালি সাধক; দার্শনিক ও ধর্মগুরু ছিলেন তিনি এবং তাঁর প্রচারিত ধর্মীয় চিন্তাধারায় স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁরা উভয়েই বঙ্গীয় নবজাগরণের তথা ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট তিনি দেহত্যাগ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবন এবং শিক্ষার মাধ্যমে শুধু ধর্মীয় জ্ঞানের পরিসরই বাড়াননি, বরং সমাজে মানবতার জন্য এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও পথ প্রদর্শন করেছেন। বিশেষ করে নবীন প্রজন্মের কাছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর জীবন দর্শন, আধ্যাত্মিক সাধনা, ধর্মীয় একতা এবং মানবতাবাদী আদর্শ নবীনদের জন্য পথপ্রদর্শক হতে পারে।

ক) ঈশ্বরের একত্ব ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ঃ—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ছিল — ঈশ্বরের একত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁর মতে, সমস্ত ধর্মই একেশ্বরবাদী এবং ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসাই সব ধর্মের মূল লক্ষ্য। তিনি বিভিন্ন ধর্মের সাধকদের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিপাদন করেছিলেন যে, প্রতিটি ধর্মের মূল উদ্দেশ্য এক এবং তা হলো ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করা। তিনি ইসলাম, খ্রিস্টান, হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য না দেখে তাদের মৌলিক আধ্যাত্মিক সত্যের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন। এই ধারণাটি বর্তমান সমাজে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক; যেখানে ধর্মীয় বিভেদ এবং সংঘর্ষ অহরহ ঘটছে। নবীন প্রজন্মের কাছে এই শিক্ষা অপরিহার্য, কারণ এটি তাদের মধ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, শান্তি এবং ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

খ) ধর্মীয় সাধনা ও আত্মানুসন্ধান ঃ—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ছিল একটি নিরবচ্ছিন্ন সাধনা এবং আত্মানুসন্ধানের পথ। তিনি কখনো কালীমায়ের পূজা করতেন, কখনো শিবের পূজা, আবার তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বরের সাধনা করার মাধ্যমে মানব জীবনে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আসে এবং তা মানুষকে সত্য ও সুন্দরতার দিকে পরিচালিত করে, নবীন প্রজন্মের জন্য এই শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা যদি নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে পারে এবং সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারে, তবে তারা নিজেদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি, আত্মানুসন্ধান ও সাধনার মাধ্যমে তারা নিজেদের ভিতরের শক্তি আবিষ্কার করতে পারবে।

গ) মানবতা ও সমবেদনা ঃ—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু আধ্যাত্মিক শিক্ষকই ছিলেন না, তিনি এক মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি মানুষের প্রতি সহানুভূতি, সদ্ভাবনা এবং ভালোবাসার বার্তা দিয়েছেন। তাঁর জীবন ছিল মানুষের জন্য নিবেদিত। ঠাকুর কখনোই কাউকে অল্পবয়সী বা প্রবীণ, গরীব বা ধনী, ব্রাহ্মণ বা দলিত ভেবে অবজ্ঞা করেননি। তিনি জানতেন, ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান এবং সব মানুষই ঈশ্বরের স্বরূপ। তাঁর এই মানবতাবাদী শিক্ষাটি আজকের নবীন প্রজন্মের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। আধুনিক সমাজে যেখানে মানুষ একে অপরকে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক বা জাতিগত কারণে শ্রেণিভুক্ত করে, সেখানে ঠাকুরের মানবিক শিক্ষা নবীনদের মধ্যে সবার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং সহানুভূতির অনুভূতি তৈরি করতে সক্ষম।

ঘ) সংসারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ঃ—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন দর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তাঁর সংসারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি সংসারকে অস্বীকার না করে ঈশ্বরের সাধনার জন্য একটি উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, মানুষের জীবনে সংসার, পরিবার এবং সমাজের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে সেগুলোর প্রতি অন্ধ অনুরাগ নয়, বরং-ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে এসব কাজ করতে হবে। তাঁর শিক্ষায় আমরা দেখতে পাই যে, ধর্মীয় জীবনের সাথে সঠিকভাবে পার্থিব জীবনকে একাত্ম করা সম্ভব। নবীন প্রজন্মের কাছে এই শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁরা যদি কর্ম, পরিবার এবং সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যকে সমন্বিত করতে পারে, তবে তাদের জীবন আরও সফলতা ও পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

Conclusion ঃ—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এবং শিক্ষা নবীন প্রজন্মের জন্য একটি অমূল্য সম্পদ, তাঁর দর্শন, সাধনা, মানবতা এবং আধ্যাত্মিকতা আজকের দিনে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আধুনিক সমাজ যেখানে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, সেখানে ঠাকুরের শিক্ষা যুবকদের আধ্যাত্মিক শান্তি, মানবিক মূল্যবোধ এবং একটি অর্থপূর্ণ জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

পুণ্যতীর্থ গঙ্গাসাগর

চয়ন মাইতি (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

সাগরদ্বীপ। বঙ্গোপসাগরের তীরে সুন্দরবনাঞ্চলের এই দ্বীপটির পৌরাণিক নাম শ্বেতদ্বীপ। এর দক্ষিণে, গঙ্গা যেখানে সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সেই স্থানটি গঙ্গাসাগর নামে পরিচিত। সামনে অসীম সমুদ্র, পেছনে শ্যামল বনভূমি এবং বালুকাময় উপকূলের মধ্যে মহর্ষি কপিলের মন্দির অবস্থিত। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে গঙ্গাসাগর একটি পবিত্র তীর্থস্থান। সাগরতীরের মূল উদ্দেশ্য হল মকর সংক্রান্তিতে সাগর সঙ্গমে পুণ্যস্নান। এই কারণে প্রাচীনকাল থেকে সাধু, মহাপুরুষ এবং মোক্ষপ্রার্থী মানুষের এখানে ব্যাপক সমাগম ঘটে।

কথায় আছে —

"সব তীর্থ বার বার গঙ্গাসাগর একবার।"

সুপ্রাচীন গঙ্গাসাগর মহাতীর্থে দীর্ঘকাল ধরে মানুষের আগমন ঘটছে। সুন্দরবন দ্বারা পরিবেষ্টিত এই সাগরদ্বীপে তীর্থযাত্রীরা বহু বিপদের সম্মুখীন হতেন। কুমীর, বাঘ এবং অন্যান্য ভয়ঙ্কর প্রাণীসহ নানা রোগ-ব্যাধিতে প্রাচীনকালে তীর্থযাত্রীরা কঠিন কষ্ট ভোগ করতেন। অনেক তীর্থযাত্রীর মৃত্যু ঘটত। এই কারণেই 'সব তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার' প্রবাদটি জন্ম নেয়। এতে স্পষ্ট হয়, তীর্থযাত্রীরা মোক্ষলাভের আশায় অশেষ কষ্ট সহ্য করে এই মহাতীর্থে আসতেন। বর্তমানে প্রশাসনের সহযোগিতায় তীর্থযাত্রা এখন সহজ হয়েছে, তবে মানুষ আজও সেই প্রাচীন লোককথাটি স্মরণ করে।

পুরাণ অনুযায়ী, রাজা সগর ঋষি ঔর্বের নির্দেশে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কথিত ছিল, কেউ যদি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে তাহলে সে সমগ্র পৃথিবীতে আধিপত্য অর্জন করতে পারবে। একমাত্র দেবরাজ ইন্দ্র তার আগে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন। সগরের শত অশ্বমেধ যজ্ঞের সঙ্কল্প শুনে ইন্দ্র আশঙ্কিত হয়ে পড়েন সগর সফল হলে তিনি মর্যাদা হারাবেন। ভীত ইন্দ্র, সগরের যজ্ঞের অশ্ব কপিল মুনির আশ্রমে লুকিয়ে রাখেন। যজ্ঞের অশ্ব খুঁজে না পেয়ে সগর, তার ৬০,০০০ পুত্রকে নিখোঁজ ঘোড়াটির সন্ধানে পাঠান। পথে সব কিছু ধ্বংস করতে করতে সগরপুত্ররা পৌঁছন কপিল মুনির আশ্রমে। ধ্যানরত কপিল মুনির আশ্রমে পৌঁছে সগরপুত্ররা অশ্বটি খুঁজে পেয়ে কপিল মুনির ধ্যানভঙ্গ করে এবং তাঁকে অপমান করে। ক্রুদ্ধ কপিল মুনি চোখ খুলে সগরের ৬০, ০০০ পুত্রকে ভস্ম করে তাদের আত্মা নরকে পাঠিয়ে দেন। বহু বছর পর, সগরের বংশধর অংশুমান কপিল মুনির আশ্রমে পৌঁছে যজ্ঞের অশ্বটিকে খুঁজে পান। অংশুমান কপিল মুনিকে তুষ্ট করবার জন্য তপস্যা করেন। অংশুমানের তপস্যায় তুষ্ট কপিল মুনি অশ্বটিকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন। কপিল মুনির কাছ থেকে অংশুমান জানতে পারেন, গঙ্গার পবিত্র জলে শ্রাদ্ধকর্মাদি করলে তবেই সগরপুত্রদের আত্মা মুক্তি পাবে। কিন্তু অংশুমান বা তার পুত্র দিলীপ কেউই গঙ্গাকে মর্ত্যে আনতে অসমর্থ হন। দিলীপের পুত্র রাজা ভগীরথ প্রথমে ব্রহ্মা ও পরে বিষ্ণুর আরাধনা করে গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পান। সন্তুষ্ট ভগবান বিষ্ণু ভগীরথকে সতর্ক করেন, গঙ্গার গতি নিয়ন্ত্রণ

করতে না পারলে সেই দুরন্ত বেগে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ভগীরথ তখন ভগবান শিবের কাছে প্রার্থনা করেন, শিব যেন তার জটায় গঙ্গাকে ধারণ করে তার বেগ নিয়ন্ত্রণ করেন। শিবের জটায় গঙ্গার দ্রুতবেগ হ্রাস পায় এবং তারপর গঙ্গা মর্ত্যে অবতরণ করেন। অবশেষে ভগীরথ পবিত্র গঙ্গা জলে তাঁর ৬০,০০০ পূর্বপুরুষের আত্মার শ্রাদ্ধকর্মাদি করে তাদের আত্মাকে নরক থেকে মুক্ত করেন।

অঞ্চলটির ভৌগোলিক অবস্থান আলোচনা করলে দেখা যায় যে, স্থানটি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সাগর ব্লকের অন্তর্গত, যা কলকাতা থেকে ১২০ কিলোমিটার দক্ষিণে ও ডায়মণ্ড হারবার থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

দ্বীপটি চারিদিকে নদীবেষ্টিত হওয়ায় মূল-ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হলো জলপথ। তাই মেদিনীপুর থেকে সাগরে যেতে চাইলে প্রথমে আপনাকে রসুলপুর ফেরি ঘাটে আসতে হবে, তারপর লঞ্চে করে যেতে হবে মায়াগোয়ালিনি ঘাট। সেখান থেকে আপনি গঙ্গাসাগর যাওয়ার জন্য টোটো বা অটো পেয়ে যাবেন। আর যদি আপনি কলকাতা থেকে যেতে চান; তাহলে আপনাকে শিয়ালদহ থেকে দক্ষিণগামী নামখানা লোকাল ধরে পৌঁছতে হবে নামখানা। স্টেশন থেকে বেরিয়ে আপনাকে টোটো করে পৌঁছে যেতে হবে নামখানা ফেরি ঘাটে, ওখান থেকে বেনুবন তারপর গাড়ির মাধ্যমে পৌঁছে যেতে পারেন সাগর বেলাভূমিতে। এছাড়াও আপনি কাকদ্বীপে নেমে পৌঁছে যেতে পারেন লট ৮ ফেরি ঘাটে, ওখান থেকে ভেসেল-এর মাধ্যমে যাবেন কচুবেড়িয়া এবং তারপর গাড়ির মাধ্যমে পৌঁছে যেতে পারেন গঙ্গাসাগর।

আর্থ-সামাজিক পরিবেশের সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায় — অঞ্চলটি হুগলি নদীর মোহনায় অবস্থিত হওয়ায় পলি যুক্ত দোঁয়াশ মাটির প্রাধান্য দেখা যায় এবং সরকারি ও বেসরকারি চাকুরিজীবির সংখ্যা সামান্য হলেও এখানকার প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। ধান এখানকার প্রধান কৃষিজ ফসল হলেও সাগরের অর্থনীতির একটি বিরাট অংশ দাঁড়িয়ে রয়েছে পান চাষের উপর এবং এখানে আলু, পেঁয়াজ, উচ্ছে, বেগুন থেকে শুরু করে প্রায় সব ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় সব্জি চাষ করা যায়। এছাড়া অল্প নোনা জলের পুকুরে মাছ চাষ (প্রধানত চিংড়ি) ও নদী থেকে সামুদ্রিক মাছ ধরেও অনেকে জীবিকা নির্বাহ করেন।

তবে কৃষিকাজ ও মাছচাষ উভয়ের ক্ষেত্রেই কতগুলি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যেমন —

* দ্বীপ এলাকা হওয়ায় মটিতে লবণাক্ততার মাত্রা বেশি, ফলে ফসলের উৎপানশীলতা অনেক সময় কমে যায়।

* উপকূলবর্তী এলাকায় ঘূর্ণিঝড় (যেমন — আমফান, বুলবুল, ডানা) প্রায়শই কৃষি ও জীবিকার ক্ষতি করে।

* দ্বীপ এলাকা হওয়ায় উৎপাদিত ফসলের বাজারজাতকরণে সমস্যা হয়।

গঙ্গাসাগরের প্রধান এবং মূল আর্কষণ হল গঙ্গাসাগর মেলা। এটি হিন্দু ধর্মের অন্যতম বৃহৎ উৎসব এবং কুম্ভ মেলার পর এটি ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশ হিসেবে পরিচিত যা প্রতি বছর মকরসংক্রান্তির সময় (জানুয়ারি ১২ থেকে ১৬ তারিখ) অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী সাগরে এসে গঙ্গার পবিত্র জলে পুণ্যস্নান করেন এবং কপিল মুনির আশ্রমে পূজা দেন।

গঙ্গাসাগর মেলা শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষের মিলনস্থল। এই মেলা ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং বিভিন্ন ভাষা ও সমাজের মেলবন্ধনকে তুলে ধরে। মেলার সময় নানারকম পণ্যের দোকান, হস্তশিল্প, লোকনৃত্য এবং সংগীতের পরিবেশনা দেখা যায়। গঙ্গাসাগর মেলার সময় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটে। এই বিশাল ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যানবাহনের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপত্তা এবং পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। এছাড়াও পরিবেশ সংরক্ষণ এবং প্লাস্টিক মুক্ত মেলা করার দিকেও পদক্ষেপ নেওয়া হয়। গঙ্গাসাগর মেলা ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং ভ্রাতৃত্বের এক অসামান্য উদাহরণ। এই মেলা আমাদের মনে করিয়ে দেয় কিভাবে ধর্ম এবং সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে বন্ধনের সেতু গড়ে তুলতে পারে। "সব তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার" — এই প্রবাদবাক্যই গঙ্গাসাগর মেলার মাহাত্ম্যকে চিরস্থায়ী করে রেখেছে।

এতকিছুর মাঝেও দ্বীপবাসীকে যে চিরাচরিত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো নদী বাঁধ ভাঙন, যা মূলত জলবায়ু পরিবর্তন, নদীর তীব্র স্রোত এবং উপকূলীয় অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়। বাঁধ ভাঙনের প্রভাবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — মানুষের কাঁচা ঘরবাড়ি জলের তলায় চলে যায়, জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ে, মাঠের ফসল এবং পুকুরের মাছ নষ্ট হয়ে যায়। বাঁধ ভাঙন রোধের জন্য সরকারি উদ্যোগে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলেও তা কার্যকরী হয়নি, প্রতিবার ভরা কোটালের সময় নদী বাঁধ ভেঙে উপকূল প্লাবিত করে জনজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান না ঘটলে অদূর ভবিষ্যতে দ্বীপটির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য অসুবিধাগুলি হল —

* ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকা হওয়ার দরুণ বছরে ২-৩টা ঘূর্ণিঝড়ের সম্মুখীন হতে হয় এবং ঘরবাড়ি ও গাছপালার প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ঘটে।

* মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম জলপথ হওয়ায় জরুরীকালীন কোনো রুগীকে স্থানান্তর করা কষ্টকর হয়ে পড়ে এবং অধিকাংশ সময় রুগী মাঝপথেই মারা যায়।

* সাগরে একটি হাসপাতাল থাকলেও তাতে চিকিৎসা ব্যবস্থার মান খুবই অনুন্নত। আজ তথ্যপ্রযুক্তির যুগে দাঁড়িয়েও এর খুব একটা উন্নতি ঘটেনি।

* মোহনায় পলি জমে চর সৃষ্টি করে ও যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম ভেসেল পরিষেবা ব্যবহত হয়।

সম্প্রতি সাগরদ্বীপকে মূল ভূখণ্ডের সাথে জুড়তে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে মুড়িগঙ্গা নদীর মেগা ব্রিজ। ৩.৩ কিমি. দীর্ঘ ৪ লেনের কেবেল স্টেড এই ব্রিজ তৈরি করতে খরচ পড়বে ১৪৩৮ কোটি টাকা। সময় লাগবে প্রায় ৪ বছর। পুরো খরচটাই করবে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে সরকারের তরফে টেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছে। সাগরদ্বীপবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই সেতু, যা আজ বাস্তবে রূপান্তরিত হওয়ার পথে। এই সেতু তৈরি হয়ে গেলে গঙ্গাসাগরে যাওয়া পুণ্যার্থীদের পথ আরো সুগম হয়ে উঠবে। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ব্যাবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে বলে আশা করা যায়।

অজানা সরস্বতী

সুমিত কুমার দাস (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

বিদ্যা, বুদ্ধি, সৃজনপ্রতিভা, চারুকলা, বিজ্ঞান তথা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির দেবী সরস্বতী। বিশ্বভুবন প্রকাশিত হয়েছে তার শুক্লজ্যোতিতে। তাই সরস্বতী দেবী জ্ঞানরূপে তিনি সর্বত্রব্যাপিনী, দেবী সরস্বতী হলেন সত্ত্বগুণের প্রতীক। তাই তিনি শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, বীণা ও পুস্তকধারিণী মহাশ্বেতা। অনেকের মতে, ভারত কুলের আরাধ্যা দেবী বলে তাঁর আরেক নাম ভারতী। বৈদিক সরস্বতী অভিন্ন হয়ে ওঠেন পৌরাণিক বাগদেবী বরদা বাগেশ্বরীর সাথে। কালক্রমে সরস্বতী হয়ে ওঠেন ভাষার দেবী তাই তাকে বাগদেবীও বলা হয়।

শুধু হিন্দুধর্মের নন, বৌদ্ধ, জৈন পরিমণ্ডলে তিনি জনপ্রিয় দেবী। আবার বিদ্যা ও শিল্পকলার ইন্দো ইউরোপীয় দেবী এথেনি, মির্নাভা প্রমুখের সাথে তার যথেষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। দেবী সরস্বতীকে প্রথমে আমরা নদীরূপে, পরে বিদ্যার দেবী রূপে কল্পনা করে থাকি। তিনি সংগীতেরও দেবী, বিভিন্ন শাস্ত্রে তথা পুরাণে দেবী সরস্বতীর বিভিন্ন কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। হিন্দু জাতির বিভিন্ন কুলের বিভিন্ন কুলদেবী রয়েছেন। দেবী সরস্বতী হলেন বাংলার আদি কায়স্থকুলের কুলদেবী। তবে সরস্বতী গঙ্গা ও যমুনার মতো এক নদীর নাম ছিলো। এই নদী হিন্দুশাস্ত্রে উল্লেখিত সাতটি নদীর মধ্যে অন্যতম। তবে বর্তমানে এই নদীর অবস্থান, উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন মত পার্থক্য দেখা যায়। অনেকের মতে হিমালয়-এর প্রস্রবন থেকে এই নদীর উৎপত্তি। এই নদীর জল ছিলো স্বচ্ছ ও পবিত্র। এই নদীর দুই তীরে গড়ে ওঠে বৈদিক সভ্যতার প্রধান তীর্থক্ষেত্র। বৈদিক কালে দেবী সরস্বতী পূজিতা হতেন শস্য ও কৃষির দেবী রূপে। সেই সময়ের নারীরা "সারস্বত ব্রত" পালন করতো উত্তম ফসল প্রাপ্তির ইচ্ছায়।

আবার অনেকের মতে নদী সরস্বতী ছিলেন ঔষধের দেবী। এমনও জনশ্রুতি আছে, বৈদিক সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিলো এই সরস্বতী নদী। এই সরস্বতী নদীকে ঘিরে প্রচলিত রয়েছে বিভিন্ন কাহিনী। এই নদীর দুই তীরের বন হয়ে উঠেছিলো বিভিন্ন ঋষির তপোস্থল। প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লেখিত, তপোবন ছিলো এই নদীর তীরে। এই নদীর তীরে বসেই ঋষি-মুনিরা শাস্ত্র রচনা করতেন। এই নদীর তীরেই রচিত হয়েছিলো কালজয়ী মহাকাব্য 'মহাভারত'। তারপরে ক্রমে ক্রমে দেবী সরস্বতী হয়ে উঠলেন বিদ্যার দেবী। এই নদীর তীরে বসে ঋষি-মুনিরা সরস্বতী নদীর গুণগান করতেন। সেই কারণে শস্যের দেবী সরস্বতী হয়ে উঠলেন 'বিদ্যার দেবী'।

তারপরে সরস্বতী নদী ক্রমে ক্রমে হারিয়ে যেতে লাগলো। অবলুপ্ত হয়ে গেলো ভারত ভূমি থেকে। তবে অনেকের মতে আজও নাকি অন্তঃসলিলা হয়ে প্রবাহিত এই নদী, অনেকের মতে এলাহাবাদের প্রয়াগে এই নদী গঙ্গার সাথে মিশেছে। আবার অনেকের মতে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে গঙ্গা ও যমুনার সাথে মিলিত হয়েছে সরস্বতী নদী। অনেকের মতে, এই কারণেই ত্রিবেণীতে সরস্বতী পূজার ব্যাপকতা প্রচুর।

দেবী সরস্বতী শুধু হিন্দু ধর্মে নন; বরং বৌদ্ধ ধর্মেও এক বিশিষ্ট দেবী হয়ে ওঠেন। বৌদ্ধ ধর্মে দেবী সরস্বতী জ্ঞানের বোধিসত্ত্ব হিসাবে পরিচিত। দেবী সরস্বতীর বৌদ্ধ চিত্রগুলি হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত। আবার জৈন ধর্মেও দেবী সরস্বতীকে জ্ঞানের দেবী রূপে শ্রদ্ধা করা হয়। জৈন ধর্মে দেবী সরস্বতীকে সকল শিক্ষার উৎস রূপে দেখা হয়। দেবী শ্রুতিদেবতা, সারদা, বাগেশ্বরী নামেও উল্লেখ করা হয়েছে।

আমাদের সনাতন শাস্ত্রে দেবী সরস্বতীর তিনটি রূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভূ-লোকে তিনি ইরা, স্বর্গলোকে তিনি ভারতী, তিনি অন্তরীক্ষে সরস্বতী। বৈদিক কালে দেবীকে জলের দেবীরূপেও পূজা করা হতো। ঋগবেদে দেবীকে জলদাত্রী আর বিদ্যাদাত্রী বলা হয়েছে। দেবী সরস্বতীকে নিয়ে অনেক জনশ্রুতিও শুনতে পাওয়া যায়। জনশ্রুতি অনুসারে সংস্কৃত মহাকবি কালিদাসই নাকি প্রথমে দেবীর পূজা করেন। কাহিনীসূত্রে মহাকবির নাকি প্রথমে কোনো বুদ্ধি জ্ঞান ছিলো না। কালক্রমে তাঁর বিবাহ হলে তাঁর বুদ্ধিমতি পত্নী তাকে নানাভাবে অপমান করেন। যা সহ্য করতে না পেরে কালিদাস চলে যান প্রাণ দিতে নদীর জলে। ঠিক সেই সময় তার সম্মুখে আবির্ভূতা হন দেবী সরস্বতী। দেবী নাকি তখনই তাকে জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধির আশীর্বাদ দেন। তারপরেই মূর্খ কালিদাস নাকি হয়ে ওঠেন মহাকবি কালিদাস। তবে এই ঘটনার কতটা সত্যতা আছে তা জানা যায় না।

আবার অনেকের মতে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নাকি বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে দেবীর পূজা করেন। এই দিন অনেকে দেবী লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুই দেবীর একত্রে পূজা করেন সম্পদ, সমৃদ্ধি আর জ্ঞান-বুদ্ধি লাভের আশায়। তবে ইতিহাস চর্চা করলে দেখা যাবে, বিংশ শতকের শুরু থেকেই দেবীর পূজার প্রচলন হয়।

আমাদের বঙ্গের ইতিহাসে দেখা যায় বাগেশ্বরী নামক এক দেবীর পূজা হতো। তবে এই দেবীর পূজা সাধারণ লোকেরা করতো না। একদল তান্ত্রিক সিদ্ধিলাভের আশাতে দেবীর পূজা করতো। কালক্রমে এই বাগেশ্বরী দেবী বিবর্তিত হয় দেবী সরস্বতী রূপে। তারপর ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে ঘরে ঘরে দেবীর পূজার প্রচলন হয়। দেবী সরস্বতীর পূজা বসন্তকালের শুরুতে হয় বলে দেবীর আরেক নাম বাসন্তী। ঋকবেদে দেবীকে শ্বেতবস্ত্রা বলা হলেও আমাদের বঙ্গে দেবী বাসন্তী বলেই পরিচিত। দেবী হলুদ বস্ত্র পরিহিতা, বীণা পুস্তক ধারিণী, হংসবাহিনী রূপে আমাদের মাঝে পূজিতা হন।

ঠাকুর নগরের মেলা

রাজকুমার মজুমদার (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

ভূমিকা ঃ ঠাকুর নগরের মেলা বা ঠাকুর নগর মতুয়া আদর্শের হিন্দুদের মহামেলা হল পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার একটি বিখ্যাত ও ঐতিহ্যবাহী মেলা। মেলাটি প্রতিবছর চৈত্র মাসের প্রথম বা মাঝামাঝি সময়ে শুরু হয় এবং মেলা সাতদিন ধরে চলে। মেলাকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, ছত্তিসগড়, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা-সহ দেশের প্রায় প্রতিটি রাজ্য থেকেই মতুয়া হিন্দু ভক্তেরা ঠাকুর বাড়ি আসেন। বাংলাদেশ, মায়ানমার থেকেও আসেন অনেক ভক্ত। 'কামনা সাগর'-এ ডুব দিয়ে পুণ্যস্নান সারতে চান সকলে। এই 'কামনা সাগর'-এ প্রতি বছর প্রচুর ভক্ত স্নান সারতে আসেন। প্রতি বছর হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথি মধু কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে পুণ্যস্নানের মাধ্যমে ওই মেলা শুরু হয়। মধু কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে পুণ্যস্নানের পুণ্যতিথিতে ভক্তরা কামনা সাগরে ডুব দেয়। কারণ তারা মনে করেন যে, এই তিথিতে স্নান করলে নাকি মনের কামনা পূরণ হয়।

ইতিহাস ঃ ১৮৯৭ সাল নাগাদ বাংলাদেশের ওড়াকান্দিতে এই মেলার সূচনা হয়। ভারতের স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে প্রমথরঞ্জন ঠাকুর ঠাকুরনগরে মেলার সূচনা করেন। এরপর থেকে প্রতি বছরই চৈত্র মাসে মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।

মতুয়া কারা? ঃ—

মতুয়া সম্প্রদায় কে গড়ে তোলেন? ঃ- মতুয়া সনাতন হিন্দু ধর্মের একটি বিশেষ সম্প্রদায়। বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার ওড়াকান্দি নিবাসী হরিচাঁদ ঠাকুর প্রেমভক্তি রূপ সাধনার ধারাকে আরো গতিশীল ও বেগবান করার জন্য যে সহজ সাধন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁকে বলা হয় 'মতুয়াবাদ'।

আর এই মতবাদের অনুসারীদেরকেই মতুয়া নামে অভিহিত করা হয়।

'মতুয়া' শব্দটির অর্থ মেতে থাকা বা মাতোয়ারা হওয়া, হরি নামে যে মেতে থাকে বা মাতোয়ারা হয়, সে-ই মতুয়া। মতান্তরে ধর্মে যার মত আছে সেই মতুয়া। অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস, গুরু-দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি শ্রদ্ধা, হরি নামে রুচি ও প্রেমে নিষ্ঠা আছে যার, সে-ই মতুয়া।

মতুয়া মতবাদে বিশ্বাসীরা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। তাঁরা বৈদিক ক্রিয়াকর্মে আস্থাশীল নয়। তাদের বিশ্বাস ভক্তিতেই মুক্তি। তাদের সাধন পদ্ধতির মাধ্যমে ঈশ্বরলাভ ও সত্যদর্শন-ই মূল লক্ষ্য। ঈশ্বর লাভের অন্যতম উপায় প্রেম। পবিত্রতা শরীর মনে প্রেম জাগ্রত করে, প্রেমময় হরি ভক্তির হৃদয়ে আবির্ভূত হন। আদর্শ গার্হস্থ্য জীবনযাপনের মাধ্যমেই মতুয়া ধর্মের চর্চা করা যায়। এই ধর্মের অনুসারীদের ১২টি নিয়ম পালন করতে হয়। যা দ্বাদশ আঞ্জল নামে পরিচিত। মতুয়া ধর্মে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মতুয়া মতবাদে বিধবা বিবাহকে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করা হয়েছে।

মতুয়া ধর্মপ্রচারকদের গোঁসাই নামে অভিহিত করা হয়। নারী-পুরুষ যে কেউ এই ধর্মের প্রচার করতে পারেন। মতুয়ারা প্রতি বুধবার একত্রে সমবেত হয়ে হরি স্মরণ করে। একে বলা হয় হরিসভা। সবাই নাম সংকীর্তন

করে এবং ভাবের আবেশে কীর্তন করতে করতে অনেক সময় বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে পড়ে। কীর্তনের সময় তাঁরা যে বাদ্য যন্ত্রগুলো ব্যবহার করে, তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, কাঁসর, জয়ডঙ্কা, শঙ্খ, শিঙ্গা প্রভৃতি।

গোঁসাইদের হাতে থাকে সোয়া হাত দীর্ঘ একটি দণ্ড, যার নাম ছোটা। এই ছোটা নিয়ে তাঁরা সামনে এগিয়ে যান, আর ভক্তরা তাঁদের অনুসরণ করেন। তাঁরা সাদা রঙে বেষ্টিত ও লাল নিশান ও গলায় করঙ্গের মালা ধারণ করেন। মতুয়ারা হিন্দু ধর্মের একটি বিশেষ ধারা হলেও তাঁদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। তাঁদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত'।

বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দিতে মতুয়াদের প্রধান মন্দির অবস্থিত। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের ত্রয়োদশী তিথিতে হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে সেখানে মেলা বসে। তাতে সমগ্র দেশ থেকে হাজার হাজার ভক্ত প্রণামী হিসাবে ধান, চাল, ডাল, তরি-তরকারি ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গো, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, আন্দামানসহ বিভিন্ন স্থানেও মতুয়ারা রয়েছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গো বেশ বড় সংখ্যক মতুয়া অনুসারীর বসবাস।

মতুয়া ধর্মের কয়েকটি মূল বাণী ঃ—

'হরি ধ্যান হরি জ্ঞান হরি নাম সার। প্রেমেতে মাতোয়ারা মতুয়া নাম যার; জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা। ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্ঠা; কুকুরের উচ্ছিষ্ঠ প্রসাদ পেলে খাই। বেদ-বিধি শৌচাচার নাহি মানি তাই।

ঠাকুর নগর বারুণী মহামেলা ঃ মতুয়া সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ঃ—

ভারতবর্ষ তথা বাংলায় মেলা হল মহোৎসব, মানুষের প্রাণের উৎসব। এ যেন বেঁচে থাকার আনন্দ। ধর্মীয় উৎসব বা দেবদেবী উপলক্ষ মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় ঃ—

"ছোট আমি নয়, বড় আমি'র মধ্যে নিজেকে অনুভব করা। নিজের প্রাণের মধ্যে সমস্ত মানুষকে পাওয়া। নিজেকে সমস্ত মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া" — তেমন উৎসবই হলো মেলা।

'মেলা' কথার অর্থ 'মিলনক্ষেত্র'। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ মেলায় মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এই মেলারও ভিন্নতা আছে। বইমেলা থেকে শুরু করে মশলামেলা, ধর্মীয় মেলা, সঙ্গীতমেলা, নাট্যমেলা, খাদ্যমেলা ইত্যাদি। কোথাও দশ দিন আবার কোথাও সাত দিন বা এক মাস ধরে মেলা হয়। পশ্চিমবঙ্গোর ভিতরে উল্লেখযোগ্য মেলাগুলোর মধ্যে ঠাকুরনগর মতুয়া মেলা অন্যতম। এটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটা থানার অন্তর্গত ঠাকুর নগরের মতুয়া মেলা বা বারুণী মহামেলা।

১৮৯৭ সালে প্রথম বাংলাদেশের ওড়াকান্দিতে মতুয়াদের মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। তখন এই মেলার নাম ঠাকুরনগর মেলা ছিল না। স্বাধীনতার পর মতুয়াদের এদেশে আগমন ঘটে। ঠাকুরবাড়ির দ্বারা 'মতুয়া' সম্প্রদায়ের মানুষদের এক করার জন্য এই ঠাকুরনগর মেলার আয়োজন করা হয়। কিন্তু কালে কালে সব ধর্মের মানুষেরা এই মেলায় আনন্দের জন্য সামিল হয়। ঠাকুরনগরে মতুয়াদের আগমনের একটা ইতিহাস আছে। এদের আদি বাসস্থান ছিল বাংলাদেশের ওড়াকান্দিতে। হরিচাঁদ ঠাকুরের হাত ধরে এই মতুয়া সম্প্রদায়ের সূত্রপাত। মূলত সমাজের পিছিয়ে পড়া বঞ্চিত শ্রেণীকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রা করানোর উদ্দেশ্যে এই মতুয়া ধর্মের সূচনা। বৈষ্ণব ও

হিন্দুধর্মকে অনুসরণ করতেন এই মতুয়ারা। তবে মতুয়ারা এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন। হরিচাঁদ ঠাকুর তৎকালীন সময়ে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্মের সহিত রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে গেলে তিনি তার উদ্দেশ্য পূরণে সফল হবেন। তার পরবর্তীতে উত্তরাধিকারীরা গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়াদের সংঘবদ্ধ করার কাজ করে গেছেন। এদেশে দেশভাগের পর তারা চলে আসেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের সুযোগ্যপুত্র পি. এন. ঠাকুর অর্থাৎ প্রমথরঞ্জন ঠাকুর এদেশে স্বাধীনতার পর বনগাঁর কাছের একটি জায়গায় আশ্রয় নেন এবং সেখানেই হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের বিগ্রহ নির্মাণ করিয়ে মন্দির স্থাপন করেন। তার সাথে সাথে হাজার হাজার মতুয়ারা দেশে চলে আসেন। বিভিন্ন জায়গায় তাদের আশ্রয় হয়। এই ঠাকুর বাড়ির নামে এই জায়গাটির নাম হল 'ঠাকুরনগর'।

পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালে প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের উদ্যোগেই ঠাকুরনগর মেলার শুভসূচনা হয়। মূলত মতুয়াদের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয় এই মেলা। প্রতি বছর হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথি মধু কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে পুণ্যস্নানের মাধ্যমে এই মেলা শুরু হয়। এই স্নান করার জন্য প্রত্যেক বছর সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরে থেকে হাজার হাজার মতুয়ারা এখানে আসেন। ঠাকুর নগরের এই মেলাকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কারণ, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ছোট ছোট মতুয়া দলগুলোকে নদী বলা যায়। মহাসমুদ্রের টানে যেমন নদী ছন্দময় বেগে ছুটে চলে, তেমনি ছোট ছোট মতুয়া দলগুলি ছন্দময় তালে তালে মতুয়া মহা মিলনায়তনে যোগদান করে। ঢেউয়ের মত নামে গানে মুখর মতুয়া দলগুলি এসে মিশে যায় মহামেলার জনসমুদ্রে। গীতে-বাদ্যে সেই জনসাগর তখন আরও ধ্বনিময়। আনন্দ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে মতুয়া মহামেলার মহামিলন ভূমি যার কোন তুলনা নেই। হাজার হাজার মতুয়া দল সুশৃঙ্খলভাবে জয়ডঙ্কা ও শিঙা বাজিয়ে, নিশান উড়িয়ে, নৃত্যের তালে তালে, নামে গানে মাতোয়ারা হয়ে মহামেলায় যোগদান করে। আবার একইভাবে সুশৃঙ্খল রীতিতে বেরিয়ে যায়। তাদের সহযোগিতার জন্য ভারতীয় রেল বিভিন্ন ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে থাকে।

বাংলা বছরের শেষ মাস চৈত্র মাসে এই ঠাকুরনগর মেলা হয়। পুণ্যস্নানের জন্য বহু মানুষের সমাবেশ ঘটে এখানে। মতুয়ারা ছাড়া অন্য জাতির মানুষেরা পুণ্যস্নানে আসে। সাতদিন এই মেলা চলে। তারপর কয়েকদিন ভাঙা মেলা চলে। স্নান সেরে পরের দিন, কেউ কেউ দিনের দিন বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এই সময় শিয়ালদহ-বনগাঁ লোকাল ট্রেন (আপ ও ডাউন) ভিড়ে ঠাসা থাকে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই মেলায় আসে ভিড়কে উপেক্ষা করে। এই মেলা দীর্ঘদিন ধরে মতুয়াদের একটা ঐতিহ্য বহন করে আসছে। ঠাকুরনগর রেলস্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে এই মেলার মাঠে পৌঁছানো যায়। ডঙ্কা, কাঁসর, শিঙা বাজাতে বাজাতে অসংখ্য মতুয়া কদিন ঠাকুরবাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গা থেকে গাড়ি করে অসংখ্য মতুয়ারা ঠাকুরবাড়ি স্নানের জন্য ভিড় জমায়। গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করা হলেও স্থানাভাবে রাস্তার পাশেও বহু গাড়ি পার্কিং করা হয়। এই মেলার জনজোয়ারকে সঠিকভাবে পরিষেবা দেওয়ার জন্য পাশ্ববর্তী কয়েকটি থানার বহু পুলিশ, সিভিক ভলেন্টিয়াররা উপস্থিত থাকেন। ঠাকুরবাড়ি যাওয়ার বিভিন্ন রাস্তায়, মেলার মাঠে, পুণ্যস্নান করা পুকুরটির চারিপাশে কোনো রকম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়ার জন্য বহু পুলিশ ও সিভিক মোতায়েন করা হয়। পুণ্যস্নানকে কেন্দ্র করে মেলা শুরু হওয়ার দু'সপ্তাহ আগে থেকেই বিভিন্ন দোকান পাটের আবির্ভাব ঘটে। খেলনার দোকান থেকে শুরু করে মিষ্টির দোকান, ভাজার দোকান, সফট টয়, আইসক্রিম, পাপড়ি চাট, ঠাণ্ডা পানীয়, চুড়ির দোকান আরও অনেক রকমের মনোহারি দোকান, একটা একশো ফুটের লম্বা গলি জুড়ে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটা ফুচকার স্টল বসে। বিভিন্ন

রকম ফাস্টফুডের হোটেল, এছাড়াও ছোট-বড় নাগরদোলা, প্যারাসুট, ডিস্কো, মরণকূপ যাদুমেলাও থাকে। বাচ্চাদের চড়ার জন্য ছোট ছোট হাতদোলনা ও লাফানোর দুই-তিনটি যন্ত্র আসে। আগে ছোট সার্কাসও এই ঠাকুরনগরের মেলায় আসত। বাইরের থেকে যেমন অনেক মানুষ দোকান দিতে এই মেলায় আসেন, তেমনি ঠাকুরনগরের স্থানীয় অনেক মানুষ ছোট ছোট দোকান নিয়ে বসেন। চপ, পাঁপড়ভাজা, চা-বিস্কুট, কাঠের আসবাবপত্র, মাটির তৈরি বিভিন্ন সাংসারিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, গাছের চারার দোকান ইত্যাদি। বেলুন, বাঁশি ও বাচ্চাদের আকর্ষণীয় খেলনা নিয়ে একদল মানুষ প্রতিদিন মেলায় আসেন এবং মেলায় ঘুরে ঘুরে এ সকল বিক্রি করেন। প্রায় বাড়িতে বাড়িতে, রাস্তার পাশে, মাঠে সাইকেল, মোটরসাইকেল, ইঞ্জিন ভ্যান ও ছোট গাড়ির জন্য গ্যারেজ করেন স্থানীয় মানুষজন। এই মেলার চারিদিকে শুধু আলো আর আলো, নাগরদোলা, মরণকূপের মোটরসাইকেলের আওয়াজ, মানুষের কোলাহলে ওই কদিন ঠাকুরবাড়ির চত্বর গমগম করে।

ঠাকুরনগরের বারুণী মহামেলাকে আন্তর্জাতিক মেলাও বলা হয়ে থাকে। একে আন্তর্জাতিক মেলা বলার কারণ, দেশের মানুষ ছাড়াও দেশের বাইরের দেশ থেকেও বহু মানুষ এই মেলায় সামিল হন ও আনন্দ উপভোগ করেন। ১৯৮৪ সাল থেকে প্রতিবছর পুণ্যলগ্নে পুণ্যস্নানের মাধ্যমে এই মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কেবলমাত্র ২০২০ সালে করোনা মহামারীর জন্য সরকারের অনুমতি না পাওয়ায় এই মেলার আয়োজন করা হয়নি।

লাল নিশান উড়িয়ে মেলার দিনগুলোতে অসংখ্য মতুয়া মেলায় আসে। মতুয়ারা বেশিরভাগ মানুষেরা হরিবোল ধ্বনি দিতে দিতে ডংকা, শিঙা ও কাঁসর বাজাতে বাজাতে মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। পরণে থাকে ধুতি, গেঞ্জি ও গামছা। অনেক পুরুষের মাথার চুল মহিলাদের মতো লম্বা, নাচতে নাচতে তারা হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের মন্দিরে প্রবেশ করেন। পুণ্যস্নানের আগের দিন মন্দির চত্বর ফুল দিয়ে খুব ভালো করে সাজানো হয়। প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের পর তার ছেলে, বউমা ও নাতিরা মন্দিরের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

আশেপাশের এলাকা থেকে মতুয়ারা ছাড়াও এই মহামেলায় কাতারে কাতারে মানুষ আসে। দেখে মনে হয় মহাসমুদ্র। নাগরদোলা চড়ে, মরণকূপের মোটর আরোহীদের অসাধারণ খেলা দেখে, ফুচকা-আইসক্রিম-চাউমিন-মোগলাই খেয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা করে বাড়ি ফেরেন। কেউ আবার মাঠে বসে থেকে মানুষের আসা-যাওয়া, কেনাকাটা দেখে আনন্দ উপভোগ করেন। মাঠের একদিকে স্টেজ করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলে। সেই অনুষ্ঠানে আনন্দ উপভোগ করেন আবাল-বৃদ্ধ বনিতারা। মতুয়াদের বারুণী মহামেলা কমিটি এই সাতদিনের মহামেলাকে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে ও এখানে আসা ভক্তদের খুব সতর্কতার সঙ্গো পরিচালনা করেন। উৎসবের সময় মেলা সংলগ্ন এলাকায় প্রতিটি বাড়ির দরজা এ সময় ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। বাড়ির মালিক পুণ্যার্থীদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে ঠাকুরনগর মেলায় মাঠসহ নানা এলাকায় বিশাল প্যান্ডেল করা হয়। দর্শনার্থীরা এবং মতুয়া ভক্তরা যাতে গরমে পিপাসায় কষ্ট না পান তার জন্য খোলা হয় প্রচুর জলসত্র।

ঠাকুরনগর মেলায় শুধু সাধারণ মানুষের ভিড় নয়, কলকাতা থেকে অনেক সেলিব্রিটিরাও আসেন। বড় মা বীণাপাণি দেবী যত দিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তার টানে অসংখ্য মতুয়াদের আগমন ঘটত এই মেলায়। কিন্তু তিনি দেহ রাখার পর ঠাকুরনগর মেলায় কিছুটা ভাটা পড়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, ঠাকুরনগর বারুণী মহামেলা মতুয়া সম্প্রদায়ের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠান। যেখানে দুই বাংলার ও দেশের বিভিন্ন জায়গার মতুয়া ভাই-বোনেরা মিলিত হয়ে জানান দেয়, মতুয়াদের অস্তিত্ব এখনো বিলীন হয়ে যায় নি। এই মেলা তাদের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এই সাতদিন অনেক মানুষের উপার্জনের মহাক্ষেত্র হয়ে ওঠে ঠাকুর বাড়ির মেলা প্রাঙ্গণ ও আশেপাশের জায়গাগুলো। এই মেলার জন্য বহু মানুষ সারাবছর অপেক্ষার প্রহর গোনে। কামনাসাগরে ডুব দিয়ে পুণ্য অর্জনের অপেক্ষায় থাকে মতুয়াসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা।

সন্ধান

ধীরাজ সেন (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

চাই আমি হাসতে,
আনন্দের সাথে;
চাই আমি শান্তি,
জীবন ভরে।
আনন্দের সাথে,
বাঁচতে চাই আমি।
খেলতে চাই আমি,
গাছের সাথে, পাখির মাঝে।
পড়তে চাই আমি,
খুশি মনে,
কিন্তু এ যেন এক স্বপ্ন —
পূরণ হবে, কোনোদিন?
জানিনা, তবে জানি,
একদিন আসবে হাসি,
করুণ বাতাসে ভেসে।
চাই না আমার,
বাংলো-বাড়ি;
চাই না আমার,
গাড়ি।
চাই শুধু ভালোবাসা,
যাতে শান্তির ঘুম
ঘুমোতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত ছোটোগল্পে জীবন-জীবিকা প্রসঙ্গ : একটি পর্যালোচনা

মধুসূদন সিং সর্দ্দার (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

ভূমিকা ঃ বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্পের সার্থক স্রষ্টা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাত্র ১৬ বছর বয়সে 'ভিখারিণী' (১৮৭৭) রচনার মাধ্যমে তাঁর ছোটগল্পের সূত্রপাত ঘটে। তাঁর প্রথম সার্থক ছোটোগল্প হল 'ঘাটের কথা' (১২৯১, কার্ত্তিক) ও 'রাজপথের কথা' (১২৯১, অগ্রহায়ণ) ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৯১ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত শিলাইদহ শাহজাদপুর ও প্রতিসর অঞ্চলে জীবন অতিবাহিত করেন। পিতার আদেশে জমিদারি তদারকি করার উদ্দেশ্যে তিনি এই অঞ্চলে আসেন। তাঁর আগেকার জগৎ থেকে এখানকার জগৎ আলাদা। এ অঞ্চলের নিসর্গ প্রকৃতি মানুষ ও সমাজ কবির মনে বিস্ময় ঔৎসুক্য ও কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। এখানে তিনি পদ্মা, গড়াই, নাগর, বড়াল, ইছামতি ইত্যাদি বিভিন্ন নদ-নদীর সঙ্গে এবং নদী তীরবর্তী প্রকৃতি ও জনপদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেলেন। ফলে এই অঞ্চলেই নাগরিক কবির উত্তরণ ঘটলো পল্লীর কবিতে।

প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো জীবিকা বা পেশার সাথে জড়িত। প্রাচীন ভারতবর্ষে জীবিকা ছিল বর্ণ ভিত্তিক। সময়ের সাপেক্ষে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে আর এই বর্ণভিত্তিক জীবিকার মধ্যে আসে সর্বজনীনতা। যাই হোক, প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো জীবিকার সাথে যুক্ত। জমিদারি দেখাশোনার জন্য রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে যান সেখানে তার লেখার মধ্যে তুলে ধরেন প্রান্তিক মানুষদের জীবন-যাপন ও জীবিকা। শুধুমাত্র উঁচু তলার মানুষ না, তাঁর ছোটোগল্পের মধ্যে টেনে এনেছেন চাষী, রায়ত, কোরফা, প্রজা, বিত্ত, মাঝি, তাঁতি, ডোম ইত্যাদি বিচিত্র বৃত্তিধারী প্রান্তিক মানুষদের কথা। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে মানুষের জীবন-জীবিকা প্রসঙ্গ কিভাবে ধরা পড়েছে তার একটি পর্যালোচনা করা হয়েছে, এই আলোচনাটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল 'একরাত্রি', 'বিচারক' ও 'উদ্ধার' এই তিনটি গল্পের সারসংক্ষেপ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন-জীবিকা ও তার নানা দিক।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল 'সমস্যাপূরণ', 'শাস্তি' ও 'দুর্বুদ্ধি' গল্পের সারসংক্ষেপ এবং উৎপাদক শ্রেণির জীবিকা, তাদের অবস্থা ও তার নানান দিক।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল 'সমাপ্তি' ও 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির জীবিকা এবং তার নানা দিক।

প্রথম অধ্যায়
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবিকা

মধ্যবিত্ত শ্রেণি ইংরেজিতে 'মিডিল ক্লাস' বলা হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণি কিছু পরিমাণে বিত্তবান একেবারে নিঃস্ব বা দরিদ্র নয়। মার্কসীয় ধারণায় পুঁজিবাদের অবাধ স্বাধীন বিকাশের ফলে সমাজের শ্রেণিবিভাগ অনেক বেশি পরিমাণে স্পষ্ট আর নগ্ন হয়ে ওঠে, যে সমাজ যত বেশি বিভক্ত সে সমাজে মধ্যবিত্তের স্থান নির্ণয় তত কঠিন। বর্তমানে ভারতবর্ষের সমাজকে অতি উচ্চবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়। মাস্টার, উকিল, বিচারক, ডাক্তার এরা সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটোগল্পে আইন ব্যবসায়ের সাথে সর্ম্পকযুক্ত চরিত্রের সংখ্যাই সর্বাধিক।

'এক রাত্রি' গল্পটি সাধনা পত্রিকাতে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ১২৯৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। গল্পের নায়িকা সুরবালার স্বামী নোয়াখালীর এক ছোট্ট শহরে সরকারি উকিল। তার কোশে অসন্তোষ ছিল না; দিব্যি পাঁচ টাকার রোজগার করতেন। তামাক টানতে টানতে দেশের দুর্দশা সম্বন্ধেও বক্তৃতা করতে পারতেন। অথচ দেশ সম্বন্ধে বিশেষ তিনি চিন্তিত ছিলেন না। গল্পের আখ্যানে উকিল রামলোচন রায়ের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি যেমন নেই, তেমনি গল্পের আখ্যানে তার বিশেষ গুরুত্ব নেই। রামলোচন রায়কে অনেকটাই মোসাহেবি চরিত্র বলা যায়। কারণ গল্পকথকের সাথে দেশের দূরবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেও প্রকৃতপক্ষে সেই বিষয় তিনি বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। ওকালতি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন নিরবচ্ছিন্ন জীবন প্রক্রিয়ায় মোসাহেবিয়ানার ইন্ধন হিসেবে কাজ করেছে। আর এদিকে নায়কের পিতা চৌধুরী জমিদারের নায়েব ছিলেন। তাহার ইচ্ছা ছিল নায়কের সরস্বতী সাধনা শেষ হইলে নায়ককে জমিদারি-সেরেস্তার কাজ শিখিয়ে কোথাও গোমস্তাগিরিতে প্রবৃত্ত করে দিবেন। কিন্তু নায়কের ধ্রুবতারা তাদের গ্রামের নীলরতন যে কলিকাতায় পালিয়ে গিয়ে ও লেখাপড়া শিখে কালেক্টর সাহেবের নাজির হয়েছে, সে নাজির না হতে পারলেও জজ, আলাদলতের হেডক্লার্ক তো হতে পারবে। সুতরাং গ্রাম ছেড়ে পিতা-মাতা ছেড়ে সর্বোপরি সুরবালার প্রভাবের গন্ডি অতিক্রম করে তরুণ নায়ক কলকাতায় এসে হাজির এবং সেখানে শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিছুদিনের মধ্যে কলকাতার বৃহৎ পরিসরে নায়কের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল। হতে এসেছিল নাজির সেরেস্তাদার; কিন্তু মাৎসিনি গরিবালডি হবার স্বপ্ন দেখিতে লাগল। এমন সময়ে নায়কের পিতা এবং সুরবালার পিতা একমত হয়ে সুরবালার সঙ্গে বিবাহ ঠিক করেন। নায়ক মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন করবে কিন্তু বিবাহ করবে না। দু-চার মাসের মধ্যে খবর পেল যে, উকিল রামলোচন বাবু সঙ্গে সুরবালার বিবাহ ঠিক হয়েছে। নায়ক তখন দেশের সেবায় চাঁদা তোলার কাজে ব্যস্ত ছিল, তাই এই ঘটনা অত্যন্ত তুচ্ছ বলে মনে হয়।

এরপরেই নায়কের ভাগ্য বিপর্যয় নেমে আসে পিতার মৃত্যুতে, পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব নায়কের কাঁধে এসে পড়ে। বাস্তবতার নগ্ন মূর্তির সামনে নায়ক শেষ পর্যন্ত মফস্বলের একটা ছোট্ট স্কুলে সেকেন্ড মাস্টারের চাকরি পেল। দেশ উদ্ধারের স্বপ্ন তখনও বিলীন হয়নি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভবিষ্যতের সৈনিক করার উপযুক্ত কাজ পেয়েছে বলে তার মনে হয়। কিন্তু সেখানে বাধা হলো হেডমাস্টার গ্রামার অ্যালজেব্রার বাইরে কোনো কথা বলতে দিতে নারাজ এবং দেখলেন ভাবি ভারতবর্ষ অপেক্ষা আসন্ন এগজামিনের তাড়া ঢের বেশি। সুতরাং দু-এক মাসের মধ্যে নায়কের উৎসাহ নিস্তেজ হয়ে গেল। নায়ক আক্ষেপ করে বলেছেন — "আমাদের মত প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিয়া নানা রূপ কল্পনা করে, অবশেষে কার্যক্ষেত্রে নামিয়া ঘাড়ে লাঙ্গাল বহিয়া পশ্চাৎ হইতে

লেজমলা খাইয়া নতশিরে সহিষ্নু ভাবে প্রাত্যহিক মাঠ ভাঙ্গার কাজ করিয়া সন্ধ্যা বেলায় একপেট জাবনা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে, লম্বে ঝম্ফে আর উৎসাহ থাকে না।" একজন তরুণ বাস্তব জ্ঞান বর্জিত চিন্তাভাবনা এবং নগ্ন বাস্তবের আবির্ভাবে তার দিশেহারা অবস্থা এবং শেষ পর্যন্ত আর পাঁচ জন অতি সাধারণ মানুষের মত সমকালীন জীবন প্রতিভাত হয়েছে।

নায়ক মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে এক স্বপ্ন নিয়ে শহরে এসেছিল; বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যোগদান করে। মাৎসিনি, গারিবালডি হবার আয়োজন শুরু করে এবং দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখতে থাকে। পারিবারিক বাস্তব অবস্থার কথা না ভেবেই ব্যস্ত থাকে। পিতার মৃত্যুর পর টের পায় পারিবারিক আর্থিক সমস্যার। গল্পের শেষ পর্যায়ে নায়কের এই ব্যর্থ জীবনে হতাশা, আক্ষেপ অনুশোচনা সবই অন্তর্নিহিত হয়েছে। মহাপ্রলয়ের সন্ধিক্ষণে দুইটি আত্মার এক সমাবেশ হয়ে উঠেছে গভীর ব্যঞ্জনা ধর্মী। বাল্য সখী সুরবালার উপর নায়কের কত না অধিকার ছিল, তাঁর স্বামী হয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থাকতে পারত মনের মধ্যেই এরকম অন্তর্দ্বন্ধে নায়ক হৃদয় জ্বালায় ছটফট করতে থাকে। এই মৃত্যুরূপী মহাপ্রলয়ের মধ্যে তার অবসান ঘটে। জীবনের এক পরম সত্যের মধ্যে ঐশ্বরিক প্রেমের জাগরণ ঘটে "পেয়ে গেলেই তো সব শেষ, আনন্দ থাকে না, না পাওয়ার মধ্যে আছে পরম আনন্দ। তাই তো না পাওয়াতে পাওয়ার এত সাধনা।" আর একটা ঢেউ অসিলে দুটি আত্মা এক হয়ে যায় কিন্তু নায়ক তা চান না, তাই তিনি বলেন — সে ঢেউ না আসুক। স্বামী, পুত্র, গৃহ, ধনজন লইয়া সুরবালা চিরদিন সুখে থাকুক। আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।"

দেহ তৃষ্ণার অতীতের, কামনা বাসনার সীমিত গন্ডির বাইরে না পাওয়ার বেদনার উর্ধ্বে সব পাওয়ার আনন্দে নায়কের শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

"ভাবলাম আমি নাজিরও হই নাই, সেরেস্তাদারও হয় নাই, গারিবালডিও হই নাই। আমি এক ভাঙা স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটিমাত্র অনন্ত রাত্রির উদয় হইয়াছিল — আমার পরমায়ুর সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে সেই একটিমাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।"

সমকালীন সময়ে রচিত 'সোনার তরী' (১৩০০ বঙ্গাব্দে) কাব্যগ্রন্থের 'পরশপাথর' ও 'আকাশের চাঁদ' কবিতাদ্বয়ের সঙ্গো এই গল্পের আত্মিক মিল লক্ষ্য করা যায় —

হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ
এই হল তার বুলি। (আকাশের চাঁদ)

চাঁদকে হাতে পাওয়ার জন্য জীবনের সবকিছুকে অবহেলা করেছেন।

তোমাদের আমি চাহিনা কারেও
শশী চাই করতলে (আকাশের চাঁদ)

আকাশের চাঁদ আকাশে রইল। কিন্তু যা সে পেতে পারতো অনায়াসে তা দুস্প্রাপ্য হয়ে উঠল।

দশা দেখে হাসি পায়
আর কিছু নাহি চাই
একেবারে পেতে চাই পরশ পাথর। (পরশ পাথর)

কিন্তু পরশ পাথর পেয়ে সে হারিয়েছে —

পাগলের মত চাই
কোথা গেল হায় হায়
ধরা দিয়ে পলাইলো সফল বাঞ্ছনা। (পরশপাথর)

সুরবালাই নায়কের পরশ পাথর। এই পরশ পাথরের মূল্য নায়ক বুঝেনি, যখন সে বুঝেছে তখন সুরবালা নায়কের নাগালের বাইরে। একক রাত্রির সান্নিধ্য ও মহাপ্রলয়কালীন মৃত্যুর সময় পরশ পাথরের সংস্পর্শে নায়কের স্মৃতি স্বর্ণ হয়ে গেছে। এই স্বর্ণস্মৃতি নিয়ে থাকতে চায় নায়ক কারণ সে জীবনের অনন্ত রহস্যকে বুঝে উঠতে পারে এই ভাবে — "পাওয়াতে না, না পাওয়াতেই আনন্দ আছে।"

'বিচারক' গল্পটি 'সাধনা' পত্রিকায় পৌষ সংখ্যায় ১৩০১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গল্পে দুটি প্রধান চরিত্র জজ মোহিতমোহন ও ক্ষীরোদা। মোহিতমোহন উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। যখন সে কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে তখন তার আচার-আচরণ বেশভূষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। সোনার চশমা, গোঁফ-দাঁড়ি এবং সাহেবি ধরনের কেশ বিন্যাস, মদ্যমাংসে অরুচি ছিল না। আনুষঙ্গিক আরো দু-একটা উপসর্গ ছিল, রক্ষকেই ভক্ষক মোহিতমোহন।

এ দিকে হেমশশী নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের বিধবা মেয়ে। বয়স ১৪ কিংবা ১৫ হবে। বাড়িতে তার মা-বাবা এবং দুটি ছোট ভাই ছাড়া আর কেউ ছিল না। তার বাবা সামান্য বেতন পায়, টেনেটুনে পরিবারের চাহিদা মেটাতে হয়। হেমশশীর বাবা তাকে সামনে না বসালে খাবার খেত না এবং সর্বকনিষ্ঠ ভাইটি স্কুল থেকে এসে তার হাত ছাড়া ভাত খেতে চাইত না। সমাজের সর্বোচ্চ ন্যায়ের সিংহাসনে বসে বিনোদচন্দ্র ওরফে জজ মোহিতমোহনের মতো শ্রেণির লোকেরা নিজের অতীতের কলঙ্কময় কর্মকে ঢেকে দেওয়ার জন্য ক্ষীরোদার মত সহজ সরল মেয়েদের জীবন শেষ করে দেয়। অথচ বিধবা হেমশশীকে ক্ষীরোদায় রূপান্তরের জন্য তিনি মূলত দায়ী।

প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক বলেছেন, গতযৌবনা ক্ষীরোদা যে পুরুষের আশ্রয় পেয়েছিল সেও জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় তাকে পরিত্যাগ করে গেল। অলংকার ও অর্থ অপহরণ করে পালিয়ে যায়। বাড়ি ভাড়া দেবে এমনকি তিন বছরের শিশু পুত্রটিকে দুধ কিনে দেবে এমন অবস্থাও নেই। সে ভেবে দেখল তার জীবনের আটত্রিশ বছরে সে একটি লোককেও আপন করতে পারে নি। ছেলেটি ক্ষুধার জ্বালায় মা মা করে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। কিছু না করতে পেরে ক্ষোভে দুঃখে শিশু পুত্রকে বুকে চেপে কুয়ার মধ্যে ঝাঁপ দেয়, শব্দ শুনে প্রতিবেশীরা ক্ষীরোদা এবং শিশুটিকে তুলতে বিলম্ব করে না। শিশুটি মারা যায় তখন ক্ষীরোদা হাসপাতালে, ক্ষীরোদা সুস্থ হয় এবং হত্যার অপরাধে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে সেশনে চালান করে দেয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম জারি হয়েছে। উকিলদের প্রচেষ্টা সত্বেও বিচারকের কোন দয়া হয়নি। বিচারক জজ মোহনের কোন দয়া হয়নি কারণ তিনি মনে করেন পতিতা ক্ষীরোদা ইচ্ছাকৃতভাবেই শিশুটিকে হত্যা করেছে। এক্ষেত্রে লেখক একটি যুক্তি দেখেছেন যে, বর্তমানে মোহিতমোহন ঘোরতর হিন্দু, হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী তিনি হিন্দু রমণীদের দেবী আখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু নিজের স্বভাব ধর্মের অভিজ্ঞতায় রমণী মাত্রই অবিশ্বাসের পাত্রী, নিয়মটা একটু শিথিল হলেই স্বৈরিণী, কুলত্যাগের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে লেখক জানাচ্ছেন, বিনোদচন্দ্র এখন শুদ্ধাচারী হয়েছে, তিনি আহ্নিক করেন এবং শাস্ত্র আলোচনা করে থাকেন। নিজের ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের যোগাভ্যাস করান। মোহিতমোহন ভজন বিলাসী। নিজেই তরকারি সংগ্রহ করতে যায়। ক্ষীরোদার মাথার চুলের মধ্যে একটি আংটি লুকানো ছিল, প্রহরীর চোখে পড়তে সেটি কেড়ে নেয়। জজ মোহিত মোহনকে অনুরোধ করে আংটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। তিনি প্রহরীকে বলেন — "কই আংটি দেখি।" — প্রহরী তার হাতে আংটি দিল। তিনি হঠাৎ যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে নিলেন, এমনই চমকে উঠলেন। আংটির একদিকে হাতির দাঁতের উপর তেলের রঙে আঁকা একটি গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত যুবকের অতি ক্ষুদ্র ছবি বসানো আছে এবং অপরদিকে সোনার গায়ে খোদাই করা আছে — বিনোদচন্দ্র।

এইখানে মহাকবি কালিদাসের রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের সাথে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দুষ্মন্তের চিন্তায় মগ্ন শুকন্তলা ঋষি দুর্বাসার আতিথ্য না করায় মুনি 'অভিশাপ দেন যার চিন্তায় মগ্ন তাকে সে ভুলে যাবে।' অভিজ্ঞান হিসেবে শুধু স্বর্ণাঙ্গুরীয়টি একমাত্র চিহ্ন। জর্জ মোহিত মোহন প্রহরীর কাছে থেকে সোনার আংটিটি হাতে নিয়ে অবাক হয়ে যান, চব্বিশ বছর পূর্বেকার স্মৃতি মনে পড়ে যায়। হেমশশী গণিকায় এবং নিকাক্ষীরোদা এক হয়ে দেবীত্বে উদ্ভাসিত হয়েছে। বিধবা হেমশশী গণিকায় এবং গণিকা ক্ষীরোদা দেবীত্বে উদ্ভাসই এই গল্পের ভাবসত্য।

রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ বিচারের সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ভাবে —

"দন্ডিতের সাথে / দন্ডদাতা কাঁদে যদি সমান আঘাত
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। ......।" (কাহিনী/গান্ধারীর আবেদন)

জর্জ মোহিতমোহন ওরফে বিনোদচন্দ্র চরিত্রহীনতা ব্যভিচার ও অসংযম দোষে দুষ্ট, ন্যায়ের সর্বোচ্চ আসনে বসে আছে সমাজের ন্যায় কর্তা হিসেবে। তিনি সহজ সরল বিধবা হেমশশীকে পতিতা ক্ষীরোদায় পরিণত করার জন্য দায়ী। স্বাভাবিক ভাবেই একটা প্রশ্ন উঠে, এক নারী যদি বহু পুরুষের সাথে সহবাস করে তাকে আমরা গণিকা বা পতিতা নারী বলি। সমাজে তাদের কোন মর্যাদা দেওয়া হয় না, উপরন্তু হেয় চোখে দেখা হয়। যদি কোন পুরষ বহু নারীতে আসক্ত হয় তাহলে তাকে আমরা কি বলবো? সমাজ তাদের বিরুদ্ধে কিছু কথা বলে না কেন? আসলে পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষরা নিজের নোংরা-কর্ম গুলোকে ঢেকে রাখার জন্য সমাজ বা ন্যায়ের আসনে বসে ক্ষীরোদার মত মেয়েদের মৃতুদণ্ড দেয় এবং ক্ষীরোদা তার পবিত্র ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ স্বর্ণ অঙ্গুরীয় আংটিটি মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাছে রাখতে চায়। এখানে লেখক ক্ষীরোদাকে পবিত্র প্রেমের দ্বারা দেবীত্বের আসনে উদ্ভাসিত করেছেন। মোহিতমোহনের রূপান্তর বা অনুশোচনা লক্ষ্য করা যায় শেষ লাইনটির মধ্য দিয়ে — "মোহিত মোহন আর একবার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবী প্রতিমার মতো উদ্ধাসিত হইয়া উঠল।"

রবীন্দ্রনাথ আকার ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইছেন জর্জ মোহিতমোহনের হৃদয় অনুশোচনার দ্বারা পবিত্র হয়েছে। হৃদয় পবিত্র না হলে দেব বা দেবীর দর্শন লাভ সম্ভব নয়। অতএব জর্জ মোহিতমোহনের সূক্ষ্ম হৃদয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি মূলত বর্ণনামূলক, কিন্তু তৃতীয় পরিচ্ছেদের গঠন নাটকীয়। ভাষা শাণিত ব্যঙ্গের দীপ্তিতে ভাস্বর। অশ্রুসজল, প্রীতি সুকোমল ও লজ্জাশঙ্কিত এই তিনটি বিশেষণের বারবণিতা থেকে প্রেমময়ী নারীর উত্থান।

'উদ্ধার' গল্পটি ভারতী পত্রিকা ভাদ্র সংখ্যার ১৩০৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র পরেশ ওকালতি করতেন। এই ওকালতি করে তিনি নিজের দারিদ্র অবস্থা দূর করেন। ওকালতি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন পরেশ তৎকালীন সময়ে। ওকালতি ছিল এমন একটি জীবিকা, যার মাধ্যমে অর্থ অর্জন ও আভিজাত্য প্রকাশ করাই ছিল শিক্ষিত বাঙালিদের কাম্য।

পরেশের স্ত্রী গৌরী প্রাচীন ধনী বংশের পরমাদরে পালিত কন্যা। স্বামী পরেশের যতদিন দৈন্য অবস্থা ছিল তার শ্বশুর-শাশুড়ি মেয়ের কষ্ট হবে বলে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাননি। গৌরী একটু বয়স্থা হয়ে পতিগৃহে এসেছিল। যার ফলে সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তগম্য বলে মনে করতেন না। গৌরীর ওপর সন্দেহ করত। গৌরী সমস্ত কিছু জানতে পেরে লজ্জায় ভেঙে পড়ে। পরেশ এখন প্রতিদিন কলহ শুরু করে সংশয় আরো তার বেড়ে যায়। গৌরী বিরক্ত হয়ে ধর্মে মন দেয়। পরমানন্দ স্বামীকে ডেকে গুরু মন্ত্রে দীক্ষা নেয়। পরমানন্দের সাধু চরিত্রের উপর দেশ-বিদেশের কেউ সংশয় করে না। কিন্তু পরেশ তাকেও কটু বাক্য বলতে ছাড়ে না। গৌরীর উপর পরেশ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, গৌরীও উদ্ধত ভাবে স্বামী পরমানন্দের কাছে গিয়ে ঈশ্বর ভক্তি করে।

একদিন গৌরীকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে পরেশ বেরিয়ে যায়। গৌরী সেদিন বাধাহীন ভাবে স্বামীজীর কাছে গিয়েছিলেন। পরেশ সন্দেহবশত বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। এদিকে স্বামীজী বাগানে গৌরীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। গৌরী বুঝতে পেরেছিল যে, স্বামীজী ভণ্ড। তিনিও বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন স্বামীর দেহের কাছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
উৎপাদক শ্রেণি

উৎপাদক শ্রেণি বলতে বোঝায় শ্রমিক, কৃষক ও খেতে না পাওয়া শ্রমজীবি মানুষদের কথা। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে তাদের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন — 'শাস্তি' গল্পের দুখিরাম ও ছিদাম রুই, 'সমস্যা পূরণ' এবং 'দুর্বুদ্ধি' গল্পে এই ধরনের শ্রেণির জীবিকার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়।

'সমস্যা পূরণ' গল্পটি সাধনা পত্রিকায় অগ্রহায়ণ সংখ্যার ১৩০০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে চারটি পরিচ্ছেদ আছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ ঝিঁকড়া কোটার কৃষ্ণ গোপাল সরকার জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর জমিদারি এবং সংসারের সমস্ত দায়ভার দিয়ে কাশীবাসী হয়। সেখানকার প্রজারা হাহাকার করতে থাকে এবং বলতে থাকে যে কলিকালে এমন ধর্মনিষ্ঠা দেখা যায় না। তার পুত্র বিপিন বিহারী একজন সুশিক্ষিত বি.এ পাশ করা যুবক। প্রজারা শীঘ্রই অনুভব করল যে, বিপিনবাবু বদ লোক; স্বার্থ ছাড়া কিছু বুঝেন না। তার বাবা কৃষ্ণগোপাল সরকার যা কিছু জমি দান করেছিলেন তা সবার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেয় বল প্রয়োগ করে, ভয় দেখিয়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখক এই গল্পের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন; অনেকে ভয়ে বশ্যতা স্বীকার করলেও কেবলমাত্র মির্জা বিবির পুত্র অছিমদ্দি বিশ্বাস কিছুতেই বাগ মানল না। বিপিন বিহারীর আক্রোশ তার উপর উপচে পড়ে। অছিমদ্দিও উদ্ধত প্রাকৃতিক যুবক সে বলল, প্রাণ দিব, কিন্তু একতিল ছাড়িব না। মির্জা বিবি নিজের ছেলে এবং পরের ছেলেকে বুঝাবার চেষ্টা করে কিন্তু দুজনের কাছে একটি কথাই শুনতে পায় — "তুমি মেয়ে মানুষ এ সমস্ত কথা বোঝ না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদে মকদ্দমা চলে হাইকোর্ট পর্যন্ত। অছিমদ্দি দেনার মধ্যে পড়ে সর্বস্ব নিঃশেষ হয়ে যায়। বিপিনবিহারী তার লাঠিয়ালদের নিয়ে হাট ঘুরতে বেরোয়। অছিমদ্দিকে কেউ আর ধার দিতে চাই না, তাই সে হাটে আসে কিছু কেনাকাটা করার জন্য; বিপিনবিহারীকে দেখে তার মাথা গরম হয়ে যায়, কাটারি হাতে নিয়ে ছুটে মারতে যায়। বিপিন বাবুর কাছে না পৌঁছতে তার লাঠিয়াল এবং হাটের লোকজন তাকে ধরে আটকায় এবং পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণগোপাল এসে অছিমদ্দি সম্পর্কে সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে তাঁর পুত্রের সামনে। অছিমদ্দি তারই ঔরসজাত সন্তান। এখানেই তার সমস্ত ভণ্ডামি ধরা পড়ে যায় রামতারণ উকিলের কাছে। সংসারে সাধু-অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এইখানে, সাধুরা কপট আর অসাধুরা অকপটতা করে। রামতারণের যে সন্দেহ ছিল, এতদিন পরে সে সমস্যার পূরণ হল।

এই গল্পে চিত্রিত হয়েছে জমিদারি শাসন ব্যবস্থার নগ্নরূপ। বিপিনবিহারী প্রজা পীড়ক পিশাচ। জোঁকের মতো প্রজাদের রক্ত শোষণ করে। রবীন্দ্রনাথ প্রান্তিক অন্ত্যজ জীবিকার কৃষক শ্রেণির উপর জমিদারি ব্যবস্থার শোষণের পাশাপাশি প্রতিবাদের চিত্র অসামান্য ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেছেন। এরসাথে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফলও তুলে ধরেছেন এই গল্পে। একজন প্রান্তিক মানুষ কিভাবে তার প্রভুর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করতে পারে তা এই অছিমদ্দি চরিত্রের মধ্যে দেখানো হয়েছে। জমিদার ও মহাজনদের শোষণে কিভাবে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম চালায় অছিমদ্দি তার জ্বলন্ত নিদর্শন। কৃষ্ণ গোপাল রায় ঠগবাজ চরিত্র, দান ধর্ম সকলেই তার লোক দেখানো। বিধবা মির্জা বিবির সাথে কাম চরিতার্থ করেছে বিষয় সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে, তার ঔরসজাত সন্তান হল অছিমদ্দি যা লোকসমাজে অপ্রকাশিত ছিল বিপিন বিহারী যখন প্রশ্ন করে যে, সবার কাছ থেকে বিষয় সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া এমনকি একটি ব্রাহ্মণ কেউ পর্যন্ত ছাড়া হয়নি তখন তিনি কিছু বলেননি, যবন সন্তানের উপর এত দয়া কেন। কৃষ্ণ গোপাল কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে —

"অছিমদ্দি তোমার ভাই হয়, আমার পুত্র"

বিপিন চমকে উঠে বলল — "যবনীর গর্ভে।"

কৃষ্ণ গোপাল কহিলেন — "হা বাপু।"

এই গল্পের অছিমদ্দি চরিত্রের সাথে দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটকের তোরাপ চরিত্রের সাথে কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায়। রোগ সাহেব যখন ক্ষেত্রমণির উপর নির্যাতন শুরু করেন তখন তোরাপ তার বুকে লাথি মেরেছিলেন। এখানে অছিমদ্দি কিছু করতে না পারলেও তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।

'শাস্তি' গল্পটি সাধনা পত্রিকায় ১৩০০ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গল্পটি তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। দুখিরাম ও ছিদাম রুই দুই ভাই আর্থিকভাবে খুবই দরিদ্র। তারা অন্যের জমিতে চাষ করে মজুরি খেটে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করে। দুই ভাইয়ের মধ্যে মিল থাকলেও তাদের স্ত্রী রাধা ও চন্দ্রার মধ্যে প্রতিদিন ঝগড়া হত। রুই পরিবারের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল এই দুই জায়ের মধ্যে কলহ। এই বিষয়ে দুই ভাই ছিদাম ও দুখিরাম-এর কোন মাথা ব্যথা ছিল না। সেদিন সকাল থেকে দুই 'জা'-র মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়েছিল এবং প্রতিদিনের তুলনায় এ দিনেও কলহের মধ্যে দুই ভাই তাদের পূর্ব নির্ধারিত কাজে বেরিয়ে যাই। পথের মধ্যে জমিদারের পেয়াদা এসে ওদের দুই ভাইকেই জোর করে নিয়ে যাই জমিদারের কাছারি বাড়ি মেরামত করার জন্যে। সামান্য জলপান করে বৃষ্টিতে ভিজেছে সারাটা দিন এবং পরিশ্রমও অনেক করতে হয়েছে। মজুরি তো না পাওয়ার মতই তার থেকে বেশি গালিগালাজ ফলে মানসিক নির্যাতন ও ক্ষুধার জ্বালায় বাড়ি যায়। বাড়ি পৌঁছে বড় ভাই দুখী তার বউ রাধার কাছে ভাত চাই। অন্যদিনের তুলনাই সেদিন মনে হয় দুই জায়ের মধ্যে একটু বেশি ঝগড়া হয়েছিল। ছোট বউ চন্দরা দাওয়ায় পড়ে অশ্রু বর্ষণ করছিল। ফলে বড়বউ বারুদের মত বলে ওঠে — "ভাত কোথায় যে ভাত দিব? তুই কি চাল দিয়া গিয়েছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।"

স্ত্রীর পৌরুষ বচন, বিশেষ করে শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষ দুখিরামের মাথায় আগুন লাগিয়ে দেয়। অগ্র পশ্চাৎ কিছু না ভেবে ক্রুদ্ধ বাঘের মত লাফিয়ে উঠে হাতের দা রাধার মাথায় সজোরে বসিয়ে দেয়। রাধার চন্দরার কোলে পড়ে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

গল্পকার রবীন্দ্রনাথ এরপর যেভাবে নৈসর্গিক প্রকৃতির বর্ণনা দিচ্ছেন যেন এই ঘটনায় কারো কিছু এসে যায় না। বাহিরে তখন পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজমান। রাখাল বালকরা মাঠ থেকে গরু নিয়ে গ্রামে ফিরে আসছে। দিন মজুরে লোকেরা যারা চরের পারে নতুন পাকা ধান কাটিতে গিয়েছিল। তারা পাঁচ-সাত জন মিলে একটি নৌকায় এপারে এসে নিজের পরিশ্রমের ফল এবং দু-চারটি আঁটি ধান মাথায় নিয়ে সবাই নিজ নিজ ঘরে ফিরে। রবীন্দ্রনাথের শিল্প মানের পরিচয় পাওয়া যায় এই বর্ণনার মধ্যে।

ঘটনার ফলশ্রুতি স্বরূপ ঘটনা শৃঙ্খল অতি দ্রুত পরিণামের দিকে এগিয়ে গেছে। মূল ঘটনার পর ঘটনাস্থলে প্রথম যার আবির্ভাব ঘটে তিনি হলেন রামলোচন চক্রবর্তী। তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে তার কোরফা প্রজা দুঃখীর অনেক টাকা খাজনা বাকি আছে। তাই রুই পরিবারে তার আগমন ঘটে। নিষ্প্রদীপ বাড়ি, চতুর্দিকে অন্ধকার, অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়া মূর্তির লোকজন, অস্পষ্ট রোদন ছেলেটা 'মা মা' বলে উচ্চ স্বরে কান্না, সমস্ত ঘটনা রামলোচনকে শিহরিত করে তুলে। দুখীকে ডাকতেই দুখী হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে অবোধ বালকের মতো। ছিদাম মনে মনে অনেক কিছু ভাবছিল প্রথম সে ভেবেছিল অধিক রাত হলেই মৃতদেহ গোপন জায়গায় সরিয়ে ফেলবে। কিন্তু রামলোচনের আবির্ভাবে এবং দুখীর কেঁদে ওঠা সামাল দেওয়ার জন্য তিনি রামলোচনের সামনা সামনি হয়। ছিদামকে জিজ্ঞাসা করে দুখীর কান্নার কারণ সে আর সামাল দিতে না পেরে অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে বলে ফেলে — "ঝগড়া করিয়া ছোটোবউ বড়োবউয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।"

ছিদাম কঠোর সত্যের হাত থেকে রক্ষা পেতে কঠোর মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। এটা ছিল হতবুদ্ধির অবস্থার হটকারিতা। কিন্তু পরে অনেক ভেবেচিন্তে সেই এ মিথ্যাকে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইলো। রামলোচন

পরামর্শ দেয় সমস্ত দোষ তার দাদার ঘাড়ে চড়িয়ে দিতে কিন্তু ছিদাম বলে — "ঠাকুর, বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।"

ছিদামের মুখ দিয়ে গল্পকার পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পচা ধারণাকে দেখিয়েছেন। তৎকালীন সমাজে নারী এক ভোগ্য সামগ্রী হিসেবে বর্তমান ছিল। ছিদাম তার বউকে যথেষ্ট ভলোবাসতো; কিন্তু সে এই সমাজের ধারণা পরিত্যাগ করতে পারেনি। তাই সে বলেছে, বৌ গেলে বৌ পাব, কিন্তু ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাব না।

এই গল্পে রামলোচনের গুরুত্ব কম না, তার মধ্য দিয়েই সারা গ্রামের লোক জেনে যায় যে, চন্দরা তার বড় জা রাধার মাথায় দায়ের কোপ বসিয়ে খুন করেছে। পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং তাকে জেরা করে বড় বউকে সে হত্যা করেছে কিনা। চন্দরা স্বীকার করে বলেছে, বড় বউকে দেখতে পারে না বলে তাকে হত্যা করেছে। পুলিশ জনমুখে তাই শুনতে পাই। তাকে আদালতে তোলা হয়। ছিদাম কখনোই মনের অন্তর থেকে চায়নি যে, চন্দরার মৃত্যু হোক। তার বড় ভরসা ছিল রামলোচনের উপর। রামলোচনের কথা মতই চন্দরাকে শিখিয়ে দিয়েছিল — "তুই বলিস বড়ো জা আমাকে বঁটি লইয়া মারিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে দা লইয়া ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ কেমন করিয়া লাগিয়া গিয়াছে।"

শেষ পর্যন্ত ফাঁসির দড়ি নিজের গলায় স্বইচ্ছায় স্বীকার করেছে স্বামীর উপর অভিমান করে। চন্দরার এই মৃত্যুর পিছনে কারা রয়েছে? কারা প্রকৃত দোষী? না চন্দরার মনে স্বামীর প্রতি ঘেন্না ও অবজ্ঞা থেকেই ছিদামকে শাস্তি দিতেই কি চন্দরার মৃত্যু বরণ করা? না আমাদের পুরুষ শাসিত সমাজ যা নারীকে শুধুমাত্র ভোগ্য বস্তু বলে মনে করে এসেছে বলে?

রাধা খুন হবার পটভূমিকায় সমাজ সচেতন শিল্পী বেশ কয়েকটি তথ্য রেখে গেছেন যা খুবই প্রণিধানযোগ্য। দুঃখিরাম ও ছিদাম বুই জমিদার নয়। তারা রামলোচনের র্কোফা প্রজা। তবু সামন্ততন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী ভূমিদাসকে জমিদারের বেগার দিতেই হতো। খুনের দিন জমিদারের পেয়াদারা দুই ভাইকে কাছারি বাড়ি মেরামত করার জন্য বল প্রয়োগ করে নিয়ে যায়। সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে মজুরি না পাওয়ার মতোই যা পেয়েছে শুধু কটূক্তিই। ক্ষুধার জ্বালায় দুঃখিরাম স্ত্রীর কাছে ভাত চেয়েছে ঘরে প্রবেশ করা মাত্র। কিন্তু রাধার প্রত্যুত্তর তার মাথায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। অন্য সময় হলে এত সামান্য কারণে এমন কাণ্ড কিছুতেই ঘটতো না। গল্পকার আগেই জানিয়েছেন যে, দুঃখিরাম একজন শান্তস্বভাবের র্নিবিরোধী মানুষ। স্ত্রীর মাথায় দা বসিয়ে দেওয়ার মত মানসিক অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পিছনে জমিদারের অত্যাচার বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রচলিত আইনের হাত অতদূর পর্যন্ত প্রসারিত নয় বলেই জমিদার পক্ষের কোনো শাস্তি হয় না।

রবীন্দ্রনাথের সমাজ সচেতন মন সামন্ততন্ত্রের এই কুফলটির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গল্পের দুই ভাই দুঃখিরাম ও ছিদাম ভূমিহীন ক্ষেত মজুর যা জমিদারের নয় রামলোচনের মত মধ্যসত্ত্বভোগী রক্ত পিপাসু জোঁকের শিকার। কিভাবে প্রজাদের রক্ত শোষণ করে তারা, তাদের কথা মত সবাই ওঠা বসা করে, তা এই গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত ভূমি ব্যবস্থা গ্রামীণ সমাজে কিভাবে শোষণের তীব্রতা সৃষ্টি করেছে তার অসামান্য দৃষ্টান্ত এই 'শাস্তি' গল্পটি।

সাধুভাষার কাঠামো ভেঙ্গো ছোট গল্পের সংলাপ হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষায়। তুই তোকারি ভাষার ব্যবহার, মাগি বা ছুঁড়ি শব্দ ব্যবহার হয়েছে অনায়াসে।

'দুর্বুদ্ধি' গল্পটি ভারতী পত্রিকায় ১৩০৭ বঙ্গাব্দে ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উত্তর পুরুষ রচিত, এই গল্পের প্রধান চরিত্র একজন ডাক্তার। ডাক্তারকে কিভাবে নিজের দুর্বুদ্ধির জন্য ভিটা ত্যাগ করতে হল তার কথা এবং বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা করেছেন তিনি। দারোগা ললিত চক্রবর্তীর সঙ্গো গল্পকথকের বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। যার ফলে উত্তরোত্তর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছিল। ললিত চক্রবর্তীর একটি বয়স্কা কন্যা ছিল তার সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্য মাঝে মাঝে কথককে অনুরোধ করত। কথকের একটি মাতৃহীনা কন্যা ছিল যার নাম শশী। কথকের সাহস হলো না বিমাতার হাতে কন্যাকে সমর্পণ করতে। শশীর বয়স প্রায় বারো-তেরো বছর। কথকের ইচ্ছা সুবিধা মত টাকা হলে কন্যাকে একটি বড় ঘরে বিবাহ দেওয়া। তুলসীপাড়ার হরিনাথ মজুদার এসে কথকের পায়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে। তার বিধবা কন্যা মারা গেছে হঠাৎ, কিন্তু তার শত্রুপক্ষ গর্ভপাতের অপবাদ দিয়ে দারোগার কাছে অভিযোগ করেছে। তাই কথককে গিয়ে বলতে হবে এই অভিযোগ মিথ্যা, কিন্তু কোথাও মনে মনে ভাবলেন যে, এই রকম ভাবে লক্ষ্মী বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় অর্থাৎ তিনি সাধারণ মানুষের কাছে এইভাবে প্রচুর অর্থ চিকিৎসার নামে শোষণ করতেন। হরিনাথ কন্যার অন্ত্যেষ্টি সৎকারের জন্য নিঃশেষ হয়ে গেল। শশী এসে কথককে জিজ্ঞাসা করে, বাবা ওই বুড়ো তোমার পায়ে ধরে কেন কাঁদছিল। কথক শশীর বিবাহের দিন স্থির করে। তার জন্য প্রচুর আয়োজন একমাত্র কন্যার বিয়ে বলে কথা। প্রতিবেশিরা সমস্ত কাজে সাহায্য করতে আসে, সর্বস্বান্ত কৃতজ্ঞ হরিনাথও দিন-রাত্রি খাটত। গায়ে হলুদের দিন রাত্রি তিনটার সময় শশীকে ওলাউঠায় ধরিল অর্থাৎ ডায়রিয়া হয়, ডাক্তারের কোন ঔষুধ কাজে লাগেনি। কথক হরিনামের পায়ে ক্ষমা চায়, বলে 'এই পাষণ্ডকে ক্ষমা করো'।

পরেরদিন দারোগাবাবু ললিত চক্রবর্তী এসেই কথককে বিবাহের পরামর্শ দেন। এই পরিস্থিতিতে কথক এমন আচরণ করে যার কারণে দারোগা বাবুর সাথে বন্ধুত্ব শেষ হয়। কাজের অবকাশে যখন একলা ঘরে বসে থাকে তখন মাঝে মাঝে কন্যার সেই করুণ স্বর কানের মধ্যে বাজতে থাকে — "বাবা ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতে ছিল।" দরিদ্র হরিনাথের জীর্ণ ঘর নিজের টাকায় তৈরি, নিজের দুগ্ধবতী গাভীটিও তাকে দেয় এবং মহাজনের কাছে যা কিছু বন্ধক ছিল সমস্ত কিছু উদ্ধার করে দেয়। গরিবদের চিকিৎসা করে কথক টাকা নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। কোনো ছোটো মেয়ের চিকিৎসা করলে নিজের মেয়ে শশী বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহে বসে যতগুলি ছোটোগল্প লিখেছেন তার মধ্যে পদ্মার বর্ণনা বা তার ভয়াবহ রূপের বর্ণনা থাকবে না তা হতেই পারে না। এই গল্পেও বর্ষাকালে বান আসে। তখন — "তখন পুরা বর্ষায় পল্লী ভাসিয়া গিয়াছে। ধানের খেত এবং গৃহের অঙ্গানপার্শ্ব দিয়া নৌকায় করিয়া ফিরিতে হয়।"

রবীন্দ্রনাথ ছোটোগল্পের যথার্থ শিল্পী তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চান যে, এরপরের গল্পের মধ্যে কিছু ঘটনা ঘটতে চলেছে। কথকের জমিদারের কাছারি থেকে ডাক এসেছে তাই নৌকায় ওঠার সময় দেখে থানার ঘাটে ডোঙা, একজন চাষা কৌপীন পরে বৃষ্টিতে ভিজছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে গতরাত্রে তার কন্যাকে সাপে কেটেছে, থানায় রিপোর্ট করার জন্য হতভাগ্যকে দূর গ্রাম থেকে ধরে এনেছে। চাষীটি নিজের গায়ে বস্ত্র খুলে মৃতদেহ ঢেকে রেখেছে। বেলা একটার সময় বাড়ি ফেরার কালে দেখে লোকটি

হাত-পা গুটিয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। টাকা নেই বলে এই অবস্থা। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে কথককে ভিটা ত্যাগ করতে হয়েছে।

'দুর্বুদ্ধি' গল্পে রবীন্দ্রনাথ দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মনুষ্যত্বহীন শোষক অত্যাচারী পুলিশরা সমাজের চোখে শ্রদ্ধার পাত্র নয়। ঘুষ নেওয়া তাদের কাছে অতিসাধারণ ব্যাপার। প্রতিনিয়ত তারা এইভাবে অন্যায় করে যাচ্ছে। ঘুষ দেওয়ার মতো সেই দরিদ্র চাষীটির কিছু ছিল না বলেই কনস্টেবল তার দায়িত্বটুকু পালন করেনি। তার প্রতিবাদ জানান ডাক্তারবাবু — "দারোগাবাবু বেতের মোড়ায় বসিয়া আরামে গুড়গুড়ি টানিতে ছিলেন। তাহার কন্যাদায়গ্রস্ত আত্মীয় মেসোটি আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সম্প্রতি দেশ হইতে আসিয়াছেন; তিনি মাদুরের উপর বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আমি একদমে ঝড়ের বেগে সেখানে উপস্থিত হইলাম। চিৎকার করিয়া বলিলাম — "আপনারা মানুষ না পিশাচ?" বলিয়া আমার সমস্ত দিনের উপার্জনের টাকা ঝনাৎ করিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলাম টাকা চান তো এই নিন, যখন মরিবেন সঙ্গে লইয়া যাইবেন; এখন এই লোকটিকে ছুটি দিন ও কন্যার সৎকার করিয়া আসুক।"

ডাক্তার তার প্রতিবাদ করেছিল বলে দারোগাবাবুর দৌরাত্মে তাকে ভিটা ছাড়তে হয়েছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মূলত দুর্বুদ্ধির ফল বহন করতে হল। যার ফলে নামকরণটিও সার্থক হয়ে ওঠেছে।

তৃতীয় অধ্যায়
নিম্নবিত্ত শ্রেণির জীবিকা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটোগল্পে প্রধান চরিত্র না হলেও আকারে ইঙ্গিতে এই সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষের কথা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। 'সমাপ্তি' গল্পে মাঝি চরিত্র বনমালী 'সংস্কার' গল্পের মেথর 'অনধিকার প্রবেশ' ও 'সংস্কারক' গল্পের ডোম প্রভৃতি মানুষ স্থান করে নিয়েছে রবীন্দ্র ছোটোগল্পে।

'সমাপ্তি' গল্পটি ১৩০০ বঙ্গাব্দে আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যায় সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পে বনমালী মাঝি নৌকা বেয়ে তার জীবিকা নির্বাহ করে। আর অপরদিকে মৃন্ময়ীর বাবা ঈশান মজুমদার মাল ওঠা নামা এবং টিকিট বিক্রয়ের কাজ করে। মেয়ের বিয়েতে আসতে তাকে দেওয়া হয়নি। গল্পের বিষয়বস্তুতেও প্রকৃতি ও মানুষের অচ্ছেদ্য আত্মীয়তা দেখা যায়। মৃন্ময়ী পাগলীর প্রকৃতির কোলে ছেড়ে দেওয়া হরিণশিশুর মতো ব্যবহার। মৃন্ময়ী কপালকুণ্ডলার সগোত্র। তবে কপালকুণ্ডলা নব কুমারের সংসার সীমায় ধরা দিয়েও তার বন্য পরিবেশে পুষ্ট অপার্থিব স্বপ্নঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সংসার (এর থেকে) তার জীবন সাধনা বড় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মৃন্ময়ীর মধ্যে আমরা অসামাজিক বন্যতা সত্বেও, পুরুষোচিত কঠোরতা সত্বেও স্বামী বিরহ তাকে সম্পূর্ণ বিপরীতে পরিবর্তিত করেছে। বালিকার থেকে এক প্রেমময়ী নারীরূপে উত্তীর্ণ হয়েছে সে।

বাক্য গঠন কৌশলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ এখানে সরল ও জটিল উভয় শ্রেণির বাক্য ব্যবহার করেছেন। বিশেষণ ক্রিয়া-বিশেষণ ইত্যাদি ব্যবহার করে সরল বাক্যকে দীর্ঘ করেন। যেমন — 'তৎক্ষণাৎ ক্ষীর দধি রুই মাছের সন্ধানে দূরে নিকটে লোক দৌড়িল।'

এক কথায় বলা যায় সরস সাবলীল প্রাঞ্জল ভাষায় লেখক গল্পের চরিত্র, প্রকৃতি পরিবেশ ইত্যাদি ফুটিয়ে তুলেছেন।

'অনধিকার প্রবেশ' গল্পটি সাধনা পত্রিকায় শ্রাবণ সংখ্যায় ১৩০১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে পরম নিষ্ঠাবতী কঠিন হৃদয় জয়কালী ধর্ম সংস্কারের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটলে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকেও অতি নিষ্ঠুর দণ্ড দিতে দ্বিধা বোধ করেন না। ডোমদের শিকারের একটি শূকর ছানা মন্দিরে প্রবেশ করে। কঠিন হৃদয়া জয়কালী শূকরের প্রাণ রক্ষা করে, তার মধ্যে করুণার আভাস পাওয়া গেলেও ডোমদের মন্দিরে প্রবেশ করতে দেয়নি। মলিন শূকর ছানাকে বাঁচাবার ছবি দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ আচার ধর্মের উপর প্রাণ ধর্মের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন — যা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম জীবন বাণী। এটা হল গল্পের একটা দিক আর একটা দিক হল ভারতীয় হিন্দু শাস্ত্রে যে বর্ণ বিভেদের কথা আছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের বাইরেও কিছু মানুষ আছে তাদেরকে গ্রামের বাইরে, স্পর্শহীন বলে মনে করা হয়। তাই জয়কালী ডোমের দলকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেয়নি। অথচ একটি শূকর ছানা মন্দিরে প্রবেশের অধিকার পায়। অর্থাৎ তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় এই নিম্ন শ্রেণির মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করা হতো না। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের মাধ্যমে তার তীব্র প্রতিবাদ জানান। 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ছোট 'আমি' থেকে বড় 'আমি' হয়ে উঠতে হবে। কবির মতে ধর্ম হল 'মনুষ্যধর্ম'। ধর্ম সংস্কারের উপর মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বাত্মবোধ একসাথে মিলিত করতে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলেছেন ধর্মের মূল মন্ত্র হল — 'যত্র জীব তত্র শিব।'

উপসংহার ঃ—

সবশেষে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আভিজাত্য মন্ডিত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তার ছোটোগল্পের মধ্যে সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণি থেকে প্রান্তিক মানুষের কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রান্তিক শ্রেণির মানুষরা তার ছোটোগল্পে প্রধান চরিত্র না হয়ে উঠলেও তা আকারে ইঙ্গিতে তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। রবীন্দ্রনাথ সমাজের খেটে খাওয়া শ্রমজীবী কৃষিজীবী মানুষদের জীবন-যাপন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন শিলাইদহ পর্বে। বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ উঁচু-নিচু, জাতি-ধর্ম সবকিছু পেরিয়ে সব জায়গায় বিচরণ করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ—

১। গল্পগুচ্ছ — আদিত্য পুস্তকালয়।

২। শ্রী ভুদেব চৌধুরী — বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার।

৩। জ্যোতির্ময় ঘোষ — কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ।

৪। তপোব্রত ঘোষ — রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ।

মায়াতরী

রোহন দাস (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

হঠাৎ এক ঝটকায় আমার ঘুম ভাঙল। দেখলাম ট্রেন বাউড়িয়া স্টেশনে পৌঁছে গেছে। ওমনি ছোটো মামা বলল, বুঝলি সোনাই ট্রেনটা প্রথম দিকে লেটে চললেও ঠিক বিকাল চারটার মধ্যে স্টেশনে ঢুকে গেছে। আমি মামার কথায় মাথা নাড়লাম। লোকজনের ভিড় একটু কমলে আমি আর মামা ব্যাগপত্র নিয়ে স্টেশনে নামলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেনটা কর্কশ আওয়াজ করতে করতে স্টেশন ছেড়ে চলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে মামা বলে উঠল, চল সোনাই স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞেস করা যাক কৃষ্ণকুঞ্জটা কোথায়? আমি মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালাম। প্রায় জনহীন স্টেশনে মাস্টারকে খুঁজে নিতে অসুবিধা হলো না আমাদের। মামা জোর গলায় হাঁক দিলো — মাস্টার দা শুনছেন! অপর প্রান্ত থেকে উত্তর এলো হ্যাঁ মশাই বলুন। মামা জিজ্ঞেস করলো — এখানে কৃষ্ণকুঞ্জটা কোথায় বলুনতো? মামার প্রশ্ন শুনে গোলগাল চেহারার স্টেশন মাস্টার একটু হকচকিয়ে গেল; তারপর গলা খাঁকড়ে বলল হ্যাঁ! কৃষ্ণকুঞ্জ ওটাতো বাংলো একটা, তা থাকবেন নাকি? মামা বলল — হ্যাঁ মশাই! ওখানেই উঠেছি। কদিন একটু হাওয়া বদল করতে এসেছি আর কি। তাছাড়া শুনেছি ওখান থেকে ঝরনাটা ভালো দেখা যায়। স্টেশন মাস্টার বলল, হাঁ তা বটে, তবে আপনারা একটু সাবধানেই থাকবেন। মামা জিজ্ঞাসা ভরে তাকাতেই স্টেশন মাস্টার বলে উঠলো — আসলে পাহাড়ি এলাকা তো বন্য পশুর উৎপাত লেগেই থাকে আর শুনেছি....., মামা পুরোটা শোনার আগেই বলল — আরে মশাই থামুন তো বন্য পশু যদি থাকে তাহলে ভালই তো একটু শিকারে বেরোনো যাবে। শিকারের কথা শুনে আমিও চুপ থাকতে পারলাম না। বলে উঠলাম — মামা আমিও যাব।

স্টেশন মাস্টারের থেকে আরো খানিকটা আলাপ পরিচয় সেরে জেনে নেওয়া গেল রিকশায় করে চৌমাথা তারপর পায়ে হেঁটে আধঘণ্টা। তারপরেই কৃষ্ণকুঞ্জ। আমি আর মামা রিকশায় চাপলাম আর ইতিমধ্যেই আমার বাউড়িয়া ঘুরতে আসার উত্তেজনা শরীরের পরতে পরতে ফুটে উঠলো। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, আমি আর ছোট মামা ওরফে বিরু মুখার্জী ভালো নাম বীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি দুজনে ভারতের অলিতে গলিতে অনেক স্থানে ভ্রমণ করেছি, কখনো পাহাড় কখনো সমুদ্র তো কখনো বনানী।

পূর্বে ঘোড়া পাহাড়ের ঢালে মেঘের খেলা আর অস্তমিত সূর্যের রশ্মির ঢেউ খেলে যাওয়ার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কিংবা কাঞ্চনজঙ্ঘার কড়া হাড় কাঁপানো শীতল বাতাস যা শরীরের সব গ্লানি বার করে দেয় আর বনানীর সবুজ যখন মনকে সতেজ করত, উফ সবই যেন আজ আবার মনের মনিকোঠা থেকে বার হচ্ছে বাউরিয়া ঘুরতে এসে। আমি আর মামা প্রতিবছরই শীতকালে ঘুরতে আসি এবারও ঠিক তাই। এসব পূর্বের ভ্রমণস্মৃতি মনে করতে করতে রিক্সা কখন যে চৌমাথা সে পৌঁছেছে তা খেয়াল করিনি। রিক্সাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমরা কৃষ্ণকুঞ্জের দিকে এগোতে লাগলাম। কৃষ্ণকুঞ্জের গেটের মুখে যখন পৌঁছলাম তখন দেখলাম আস্ত একটা বাংলো বাড়ি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মামা বলল, ঘুরতে এসে এমন যদি বাংলো বাড়ি পাওয়া যায় তাতে মন্দ কি! আমি হাসলাম। কৃষ্ণকুঞ্জের মূল গেটটি দেখে মনে হল অনেকদিন ব্যবহার করা হয়নি; তাই গেটটা একটু জোর

দিয়ে খুলতেই ক্যাচ ক্যাচ করে শব্দ করে খুলে গেল। কৃষ্ণকুঞ্জ দোতলা নিয়ে এক বিশাল বাড়ি, পিছনটায় আছে পাহাড় আর ঝর্না, এছাড়াও আছে সুন্দর ফুলের বাগান। বাড়িটার মূল পথ দিয়ে প্রবেশ করতেই দেখলাম, একজন লোক কৌতুহলী হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। বলল — আরে মুখার্জী বাবু নাকি, আমি সোমপ্রকাশ ভদ্র। এখানকার ম্যানেজার আমি, আমি আপনার টেলিগ্রাম আগে থেকেই পেয়েছিলাম, তাই সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। নমস্কার সোমপ্রকাশ বাবু, তাহলে তো কোনো চিন্তাই নেই, সব যখন তৈরি, মামা প্রত্যুত্তরে বলল। এরপর সোমপ্রকাশ বাবুর সাথে দীর্ঘ আলাপ পরিচয় সেরে ঘরের চাবি নেব; অমনি মামা বলে উঠল — মশাই আমার কিন্তু দুটো রুম চাই। আসলে আমি একটু নৈশ ভোজ সেরে হুঁকোতে টান দিতে ভালবাসি, এদিকে আমার ভাগ্নেটা হয়েছে একেবারে বিপরীত। ও এসবের গন্ধই নিতে পারে না। ম্যানেজার বলল — কোন সমস্যা নেই মুখার্জী বাবু ঘর তৈরি আছে। এই নিন দুটি ঘরের চাবি। চাবিতে দেখলাম তিন নম্বর আর নয় নম্বর দুটি সংখ্যা লেখা আছে। জানলাম দুটি ঘরই সামনাসামনি, তাই অসুবিধা হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু অসুবিধা অন্য জায়গায়; শুনলাম সোমপ্রকাশ বাবু সন্ধ্যেবেলায় বেরিয়ে যাবেন। মামা একটু বিরক্তি স্বরে বলল — মশাই আপনার সাথে একটু আড্ডা দেওয়ার ইচ্ছা ছিল রাতে। সোমপ্রকাশ বাবু বললেন — মুখার্জী বাবু ওসবের জন্য বিস্তর সময় পড়ে রয়েছে। তিনি যাওয়ার আগে বলে গেলেন — রাতে কেয়ারটেকার থাকবে, সেই সব ব্যবস্থা করে দেবে। আমরা কথা বলে উঠতে যাব তখনই কেয়ারটেকার এসে বলল — বাবু রাতে রুটি মাংস খাবেন তো! মামা বলল — আহা করেছো কি? তা কি হে তোমার নামটা কি? আজ্ঞে হরিচরণ। তা হরিচরণ একটু জলের ব্যবস্থা করো দেখি, এই যে বাবু দেই। আমরা হাত পা ধুয়ে দোতলার ব্যালকানিতে বসে অস্তমিত সূর্যের আভা আর পাহাড়ের কোলে তার স্নিগ্ধ ঝলকের দৃশ্য দেখছিলাম আর তখন মামা আওড়াচ্ছিল —

নমো নমো নমো সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি
গঙ্গার তীরে স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।

কিছুক্ষণ পর আমি আর মামা চা খেয়ে একটু আড্ডা দিলাম। বেশ খানিকক্ষণ আড্ডা দেওয়ার পর আমি আর মামা রাতের খাওয়া শেষ করে শুতে চলে গেলাম, ঘড়িতে দেখলাম রাত তখন নটা। এতক্ষণে মামাও বোধ হয় হুঁকোতে টান দিতে শুরু করেছে। রাতে ঘুমিয়ে ছিলাম না তন্দ্রা মত লেগেছিল তা ঠিক বলতে পারবো না। কিন্তু ঘড়িতে তখন ডং ডং করে আওয়াজ হতে লাগল, তখন তন্দ্রাটা এক চটকায় ভেঙে গেল। ব্রিটিশ রয়েলস বলছে রাত তখন বারোটা। মনে হল ঘরে এখন আমি একা নই আরো একজনের অস্তিত্ব অনুভব হতে লাগলো। জানালার কাঁচ দিয়ে আসা চাঁদনী আলোয় কোন এক নারী মূর্তির অবয়ব চোখে পড়ল। ঠিক আমার মাথার পাশে, মনে হল টু শব্দটি করলেই সে আমার মাথা চিবিয়ে খাবে। এই ভয় কাটিয়ে কিভাবে যে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা জানি না। পরের দিন সকালে চা খাওয়ার সময় মামাকে সবটা বলি। মামা বরাবরই ডানপিটে, তাই এইসব আজগুবি ঘটনা বিশ্বাস না করে উড়িয়ে দিল। আর চায় চুমুক দিয়ে বলল, দূর বোকা এত ভয় পেলে চলে? যেখানে ঘুরতে এসেছিস সেখানকার মজা নেতো বাবু। আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, না মামা স্টেশন মাস্টার আমাদের কিছু একটা ইঙ্গিত করেছিল। মামা বলল — আরে এসব এলাকায় বাইরে থেকে ঘুরতে আসা লোকেদের একটু ভয় দেখাতে চায়, বাদ দে এসব কথা। চল বাইরেটা ঘুরে আসা যাক। সারাদিন বাইরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বাংলোতে ফিরলাম। রাতের খাবার শেষ করে শুতে যাব, অমনি শুনলাম আমাদের কেয়ারটেকার হরিচরণ

সে নাকি আজ রাতে থাকবে না। সব সবজি ও বাজার শেষ, তাই রাতে চৌমাথা দিয়ে গাড়ি ধরে শহরে যাবে বাজার করতে। আবার ভোরে চলে আসবে। আমি এতে খানিকটা বিরক্তই হলাম, কিন্তু মামা পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল — আরে আমি তো আছি এত ভয় কিসের আর তোর ভুতুড়ে কথা যদি সত্যি হয়; তাহলে ভালো অ্যাডভেঞ্চার হবে। চল তোর সাথে আজ আমি শোবো। আমি আশ্বস্ত হলাম। আমি শোয়ার পর দিব্যি ঘুম দিতে লাগলাম। পাশে মামা আছে, তাই আর ভয় লাগলো না। ঘুম খানিকটা হয়েছে, কিন্তু আবার ব্রিটিশ রয়েলস ডং ডং করে উঠলো। রাত বারোটা, ছোটমামা বোধ হয় ঘুমোচ্ছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে একটু আঁতকে উঠে বলল — সোনাই আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে.....।

আমি ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। চাঁদনী আলোয় আজও দেখলাম সেই একই নারী মূর্তি আমাদের সামনে, কিন্তু তার হাত মামার গলায়। মামা তার কাঁকন জোড়া হাত দুটি ছাড়াতে মরণপণ চেষ্টা করছে, আমি সবকিছু দেখেও যেন কিছু করতে পারছি না, আমাকে যেন কে বেঁধে রেখেছে, হঠাৎ মনে হতে লাগলো কৃষ্ণকুঞ্জকে যেন জগৎ ত্যাগ করেছে আর দূর দিয়ে কাক পক্ষীরা তা দেখে খিল খিল করে হাসছে, এ তাদেরও অরুচি যেন প্রেত নিবাস। চাঁদের আলোয় আরো একবার সেই নারী মূর্তির হাত দুটি ঝলসে উঠল, আমি তা দেখে আঁতকে উঠলাম। অশরীরীর সঙ্গো ধস্তাধস্তিতে মামার জামা ছিঁড়ে গেল আর সেই সাথে মামার বুকে থাকা রুদ্রাক্ষটা লাল হয়ে এক গোলোকের আকার নিল আর সাথে সাথেই এই প্রথমবার সেই নারী মূর্তি মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। চোখ নেই বললেই চলে, দুটি অগ্নিপিণ্ড কোটোর দুটিকে ভরিয়ে রেখেছে আর তার রক্ত ঝরা মুখটা আরও রক্ত চাইছে। এতক্ষণে সেও মামার রুদ্রাক্ষটার দিকে তাকিয়েছে, অমনি সে এক ভয়ানক আর্তনাদ করে উঠলো। সেই রাতে কিভাবে যে কৃষ্ণকুঞ্জ ত্যাগ করে চৌমাথা পৌঁছেছিলাম তা ঠিক বলতে পারবো না। চৌমাথা গিয়ে দেখলাম, এক সাধু বটবৃক্ষের নিচে ধ্যান করছে, আমরা তার কাছে গিয়ে জল খেয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। সাধু বাবা সব ঘটনা শুনে একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় কেশে বলতে শুরু করল — এই কৃষ্ণকুঞ্জের আগের নাম ছিল মায়াতরী। আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে পাঁচজন যুবক ঘুরতে এসে মায়াতরীতে রাত্রি নিবাস করেছিল। সেই সময় মায়াতরী দেখভাল করার দায়িত্বে ছিল দয়ারাম ও তার মেয়ে মঞ্জুরী। শোনা যায়, ওই পাঁচজন যুবক মদ্যপ অবস্থায় মঞ্জুরীর ওপর শারীরিক অত্যাচার করে, আর তারপর উপর তালার ওই পশ্চিম দিকের ঘরে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলে। আর এই ঘটনার কিছু দিনের মধ্যেই মঞ্জুরীর বাবা দয়ারাম শোকে পাগল হয়ে যায়। সাধু বাবা একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল, কিন্তু এই ঘটনায় নাকি এক যুবকের কোন দোষ ছিল না, সে সবই জানতো তবু আদালতে যখন এই ঘটনার মামলা ওঠে, তখন সে বন্ধুদের পক্ষেই সাক্ষী দিয়েছিল। সে যাত্রায় তারা অর্থের জোরে বেঁচে গিয়েছিল। লোকমুখে শুনেছি, মঞ্জুরিকে যেদিন হত্যা করা হয়, সেই দিনটি ছিল পয়লা অগ্রহায়ণ। তাই আদালত থেকে মুক্ত হওয়ার পর প্রতিবছর পয়লা অগ্রহায়ণের দিন তাদের মধ্যে কেউ না কেউ ঘুমের মধ্যে মারা যায় আর তাদের প্রত্যেকের গলায় হাতের ছাপ পাওয়া যায়। প্রতিবার সেই হাতের ছাপ পরীক্ষা করে দেখা যায়, সেটা তাদের নিজেদেরই হাতের ছাপ। আচ্ছা তোমরাই বলো, এটা কি কখনো সম্ভব! তাই আজও এই রহস্যের সমাধান হয়নি। লোকমুখে শুনেছি — দয়ারাম যখন পাগল হয়ে ঘুরতো, তখন পাঁচ যুবকের মধ্যে একজনের নাম ধরে চেঁচাতো যেন সেই যুবক এখনো বেঁচে আছে। এই ঘটনার পর বাংলোর মালিক বাংলো বিক্রি করে দেয় আর নতুন মালিক নাম পরিবর্তন করে রাখে কৃষ্ণকুঞ্জ। সাধু বাবা থামতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, যে

বেঁচে আছে তার নাম কি? সাধু বাবা কাশতে কাশতে বললেন, যতদূর মনে পড়ছে তার নাম ছিল বিরু।

শুনে আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো, সাথে সাথে আমার খেয়াল হলো আজও তো পয়লা অগ্রহায়ণ। তাহলে আমার নয় নাম্বার ঘরই ছিল ওই মর্মান্তিক ঘটনার একমাত্র প্রমাণ। ছোটোবেলায় মা যেন বলেছিল, ছোটোমামা কোথা থেকে ঘুরে এসে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল আর পূর্বের সব স্মৃতি ভুলে গিয়েছিল। এসব কথা মনে করতে করতে দেখলাম মামার চোখে বিন্দু বিন্দু জলস্রোত গড়িয়ে পড়ছে।

গোরাচাঁদ

কৌস্তভ ঘোষ (প্রাক্তন ছাত্র)

অগুন্তি তারার কিবা আছে প্রয়োজন
চাঁদ একাই তো প্রায় লক্ষ-যোজন
প্রেম রূপ ধরে নদীয়া ভূধরে
সুখের গোলক ছাড়ি
ভাগীরথী তীরে, শচী দেবী বুকে
আনিলেন শ্রী গৌর হরি।
দেব দুর্লভ শুভ প্রেম সম্পদ
হেলায় দিলেন দানে!
দীন হীন জনে পাষাণ বিদরে,
নব প্রাণ জাগালেন প্রাণে।
তব করুণা সনে দিব কিসের উপমা?
ভাষা নাহি তো বারে ফিরি!
তোমার যুগল নয়ন তারায়
ব্যথাতুরা রাধা হেরি।
জীবন জনম রতন রতি
পুলকে শিহরিত তনু মহাভাবে,
রাজায়-প্রজায়-বিপ্র সবে সাজে বৈষ্ণব
ভুলি ভেদাভেদ একাকারে।
ও চরণ লাগি অধম কৌস্তভ
করিয়াছি নত প্রার্থনা
দয়া করে প্রভু এ দাস জনেরে
দিও চরণ ধূলার কণা॥

শেষ সন্ধান

রাজকুমার মণ্ডল (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

অফিসের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। কিন্তু ছুটির দিন শেষ হবার আগেই জরুরি চিঠি পেয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে। হাওড়া থেকে লালগোলা এক্সপ্রেস ধরে নামবো মুর্শিদাবাদ আর সেখান থেকেই অটো কিংবা ট্রেকারে ঘন্টা দেড়েকের পথ অতিক্রম করলেই আমার অফিস। প্রায় তিন বছর তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরে কাজ করেছি আর এখানে মাত্র আট মাস হল বনদপ্তরের চাকরি পেয়ে অফিসার পদে নিযুক্ত হয়েছি।

আমি এখানে যে পদে কর্মরত হয়েছি, তার প্রধান কাজ হল — কাঠের চোরাচালান থেকে শুরু করে চোরা শিকারীদের রোধ করা।

জরুরি চিঠিতে ফিরে যেতে হচ্ছে বলে সঙ্গে জিনিসপত্র বিশেষ কিছু নেই, তাছাড়া কনফার্ম টিকিটও পাওয়া যায়নি। স্টেশনে পৌঁছে যাত্রী তালিকায় নিজের সিট নম্বর দেখার সময় লক্ষ্য করলুম যে, আমার সিটের আগে ও পরের ব্যক্তিরাও মুর্শিদাবাদ যাচ্ছেন।

রাতে খাবার মতো জল-খাবার নিয়ে ট্রেনে চেপে বসলুম। এই চাকরিতে এই প্রথমবার হলেও আগের চাকরিতে অন্তত চারবার বাড়ি এসেছিলুম। তবে বাড়ি থেকে ফেরার সময় এমন অস্বস্তির বা উদ্বেগ-এর প্রকাশ লক্ষ্য করিনি। মনের এমন অস্থিরতার বিশেষ কোনো কারণ উপলব্ধি করতে না পেরে ঘুমাবার চেস্টা করলাম।

হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়ার পরেও আমার সামনের সিট ফাঁকা থাকায়, ধরে নিলুম যে বা যিনি এই সিটের অধিকারী হোক না কোনো তিনি নিশ্চয় ট্রেন মিস করেছেন।

মনের মধ্যে নানান কিছু ভাবতে ভাবতে কখন যে যাত্রাপথের একঘণ্টা রাস্তা অতিক্রম করে ফেলেছি তা বুঝলাম না। হঠাৎ ট্রেনের ব্রেক কষাতে চেতনা ফিরল বুঝলুম কাঁচরাপাড়া এসে পৌঁছেছে।

এতক্ষণ বাইরের দিকে দেখছিলুম, মুখ ফেরাতেই দেখলুম, কখন এক ব্যক্তি সন্তর্পণে আমার সামনের সিটে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন কামরাটি অদ্ভুত মেঠো ও শিউলি ফুলের গন্ধে মেতে উঠলো। তবে এসব কিছুকে উপেক্ষা করে যাত্রাপথের ক্লান্তি দূর করতে চা-এর সন্ধানে ট্রেন কামরায় চক্ষুগোচর করলাম কিন্তু না, কোনো হকার নেই। আজ আর হয়তো চা খাওয়া হবে না। তাছাড়া রাত হয়েছে, এই মধ্যরাতে হকার আসবে বলেও মনে হয় না।

তবে চিন্তার অবসান হতে না হতে সামনে বসা ব্যক্তিটি এক কাপ চা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

ট্রেনের মধ্যে অচেনা মানুষ। তাছাড়া এতক্ষণের যাত্রায় তার সঙ্গে আলাপটুকু পর্যন্ত হয়নি। আর আমি যে চা-এর সন্ধান করছি, তা তিনিই বা কিভাবে বুঝলেন। একথাই ভাবছি, তখন প্রথমবারের মতো আমার সামনে বসা ব্যক্তি বলে উঠলেন — নিন নিন ইতস্তত বোধ করবেন না।

আপনি হয়তো ভাবছেন যে, আমি কি ভাবে বুঝলাম যে আপনি চায়ের সন্ধান করছেন? আপনি যেভাবে ট্রেন কামরার এমাথা থেকে ওমাথা তাকাচ্ছিলেন তাতেই আমি বুঝে গেছি। তাছাড়া আমি অচেনা মানুষ.....।

এবার নড়েচড়ে বসে বললুম — না না ওসব কিছু না। তবে না বললে কি হবে আমি নিজেই বুঝলাম যে আমার হাব-ভাব তা বলছে না। তাই মনে যে আশঙ্কা ছিল তা কাটাতে বল্লুম, যদি এর সঙ্গো গরম সিঙ্গাড়া থাকতো। আমার কথা শেষ হতে না হতে ভদ্রলোকটি তার ব্যাগ থেকে একখানা প্লাস্টিক কাগজে বাঁধা ঠোঙা থেকে একখানা সিঙ্গাড়া বার করে আমায় দিতে দিতে বললেন — মেয়েটার জন্য নিয়েছিলুম। মেয়ে আমার বড্ডো সিঙ্গাড়া খেতে পছন্দ করে, তবে আপনি একটা নিন।

আমি টিফিন করার সময় কিনেছিলুম। তখন গরম ছিল, এখন ঠান্ডা হলেও সদ্য ভাজা কিনেছিলুম, আশা করছি আপনার ভালো লাগবে।

চা আর সিঙ্গাড়া খেতে খেতে জানতে পারলুম আমি যে অঞ্চলে সদ্য চাকরি পেয়ে এসেছি, ভদ্রলোক সেই এলাকারই বাসিন্দা।

আরো বেশ কিছুক্ষণের আলাপে জানতে পারলাম, ভদ্রলোকের নাম যদু সাঁতরা। বাড়িতে স্ত্রী, সাত বছরের পুত্র এবং তিন বছরের কন্যা আছে। বাবা গেলে ভিটে বাড়ি ছাড়া তার আর কিছু নেই। জমিদারের জমিতে ভাগচাষে জমিচাষ করে। তাছাড়া আগের বর্ষায় অনাবৃষ্টিতে ফসল হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই কোলকাতায় গিয়েছিলেন কুলির কাজ করতে। উপার্জন খুব খারাপ হয়নি।

উপার্জিত টাকাতেই ছেলেমেয়েদের জন্য খাবার আর জামা-কাপড় কিনেছে আর স্ত্রীর জন্য নিয়েছে শিউলি ফুলের মালা।

সরকার থেকে কোনো সাহায্য পেয়েছে কিনা তা জানতে চাইলে তিনি বলেন — লেখাপড়া জানিনা বাবু। তবে গ্রামের ছেলেপিলেরা বলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আমার নাম নাকি ছিল কিন্তু সত্যি বলছি বাবু আমি কোনো টাকা পাইনি।

তবে নিরঞ্জনবাবু একসময় আমাদের গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। বেশ সৎ মানুষ, গাঁয়ের পাঁচজন তাকে মানে। তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন — গরীবদের কিছু হবে না রে। আর যদি গরীবদের জন্য কিছু আসে সে তো গ্রামের মোড়ল মাতব্বরদের দোতালার ঘরের জলছাদের কাজে লেগে যাবে আর তার পর কিছু বাঁচলে পাবে ক্লাবগুলো। বুঝিসনে ক্লাব চালায় যুব সদস্যরা আর তাছাড়া ওরাইতো দেশের ভবিষ্যৎ। এক একটা ক্লাব সরকারের ভোট ব্যাঙ্ক, তাই তাদের জন্য তো কিছু করতে হবে!

এসব কথা বলতে বলতে তার চোখ যেন হঠাৎ করে ধারালো অস্ত্রের মতো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। সে চোখের তীক্ষ্ণতা এতটাই যে আমি আর তার চোখে চোখ রাখতে পারলুম না। দৃষ্টি সরে তার পোশাকে পড়তে লক্ষ্য করলুম যদুবাবু যে ধুতি খানা পরে আছেন তা প্রায় জলে ভিজে জ্যাব জ্যাবে হয়ে শরীরকে আষ্টেপৃষ্টে করে রেখেছে।

আমি কিছু বোঝাবার আগেই ট্রেন এসে দাঁড়ালো কৃষ্ণাপুর স্টেশনে। যদুবাবু তড়িঘড়ি করে নেমে জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তার চোখে কিছুক্ষণ আগে যে ধারালো অস্ত্রের মতো তীক্ষ্ণতা দেখেছি তা খানিকের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে অসহায়তার স্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠতে দেখলুম।

তার এরূপ তড়িঘড়ি নেমে যাবার কারণ বুঝতে না পেরে ট্রেনের গেটে আসার আগেই ট্রেনটি স্টেশন

ছাড়লো। গেট থেকে তাকিয়ে দেখলুম যে, যদুবাবু তখনও স্টেশনের সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ট্রেনের গতির সঙ্গো ব্যস্তানুপাতিক হারে যদুবাবুর মুখখানা অস্পষ্ট হতে হতে একটা সময় নিরুদ্দেশ হল।

তার এরূপ আকস্মিক চলে যাবার কারণ জানতে না পারলেও, একটা বিষয় বুঝলাম যে এতক্ষণ যে মেঠো গন্ধ আর শিউলি ফুলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল, তা যদুবাবুর সঙ্গো যেন উধাও হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন মুর্শিদাবাদ স্টেশনে এসে পৌঁছলে, জিনিসপত্র নিয়ে নেমে পড়লুম স্টেশনে। অফিসের পেয়াদা ভঞ্জনবাবুকে দেখে বুঝলাম যে, তিনি আমাকে নিতে এসেছেন। আমাকে দেখে মৃদু হেসে ব্যাগখানা নিয়ে বললেন — চলুন বাবু।

স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে দুজনে চেপে বসলুম গাড়িতে। রাত বেশি হবার জন্য গাড়িচালক দু গুণ বেশি ভাড়া চাইলে, আমরাও তাতে রাজি হলাম। স্টেশন বাজার পার করে একটি রাস্তা গেছে বনদপ্তর অফিসের দিকে আর একটা গেছে অফিসের উত্তর দিকের পাড়াতে। আর এই উত্তর পাড়াতেই এই গ্রামের প্রাইমারি স্কুল। গাড়ি বাজার পার হতেই ভঞ্জনবাবু গাড়ি চালককে উত্তর পাড়ার স্কুল মাঠে গাড়ি নিয়ে যাবার কথা বলে।

এই মধ্যরাতে উত্তর পাড়ার স্কুলে যাবার কারণ জানতে চাইলে, তিনি বলেন — গতরাতের ঝড়বাদলে বনদপ্তরের অফিস ঠিক থাকলেও আমার থাকার কাঠের বাড়িখানা হেলে পড়েছে। তাই সাময়িক ভাবে আমাকে উত্তর পাড়ার প্রাথমিক স্কুলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর ভঞ্জনবাবু বলল — জানেন তো বাবু গতরাতের ঝড়-বাদলে এ পাড়ার এক পরিবারের সকল সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। খুব কষ্টের মধ্যে দিন কাটালেও বাপের একমাত্র ছেলে তাই নানা অভাব অনটনে ভিটে ছেড়ে যায়নি। তবে শুনলাম নাকি কাল দুপুরে সে কোলকাতা থেকে এসেছে আর রাতের ঝড়ে তার পরিবার ঘরচাপা পড়ে মারা গেল।

কথা শেষ করে ভঞ্জনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। আমিও আর কিছু বল্লুম না। শুধু মনে মনে ভাবলুম, ভূগর্ভ থেকে শুরু করে, গাছ-পালা-কীট-পতঙ্গা তাছাড়া পৃথিবীর বাইরেও মানুষের জ্ঞানের পরিধি ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু বুঝতে পারলো না যে কখন এক রাতের প্রাকৃতিক তাণ্ডব গ্রামের এক পরিবারের সর্বসমাপ্তি ঘটিয়েছে।

রাতের অন্ধকারে খুব ভালো উপলব্ধি করতে না পারলেও গতরাতের দুর্যোগ এদেশের পথঘাট, নদী-নালাকে এক সমাধিতে সমাধিস্থ করেছে তা যাত্রাপথের চারপাশের পরিবেশে স্পষ্ট। রাতের অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পবনদেবের এরূপ নির্মমতাকে দেখতে দেখতে এসে উপস্থিত হলুম আধভাঙা প্রাচীরের কাছে।

ভঞ্জনবাবু গাড়ি থেকে নেমে আধভাঙা প্রাচীরের ওপর একটি বাড়িকে নির্দেশ করে বললেন — আমরা পৌঁছে গেছি। এখানেই আপনার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাচীর পেরিয়ে একখানা ছোটো মাঠ আর তার পরেই স্কুল।

ভিতরে ঢুকে দেখলাম ঘরের এক কোণে একটি খাট পাতা আছে, আর এক কোণে একটি টেবিল। যার ওপর বেশকিছু ফাইল রাখা আছে।

পরের দিন সকালে উঠে বাইরে বেরিয়ে চারপাশের পরিবেশ দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ পড়লো স্কুলের পাশের সেই বাড়িটির দিকে।

সকালের জল-খাবার খাওয়ার পর এলাকা পরিদর্শন আধিকারিক এলে ভঞ্জনবাবুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম ত্রাণ সরবরাহের জন্য। ত্রাণ সঠিকভাবে গ্রামের সকল পরিবারে কাছে পৌঁছে দিতে পারছি কিনা তা সঠিক ভাবে বুঝতে সঙ্গে ভোটারের তালিকা খানা রাখলাম।

সারাদিন ত্রাণ সরবরাহের পর সন্ধ্যার আগে এসে দাঁড়ালুম স্কুলের কাছের সেই ভেঙে পড়া বাড়িটির কাছে।

সারাদিন ভঞ্জনবাবু তেমন কিছু বলেন নি কিন্তু এবার তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন — কি হবে স্যার ওখানে গিয়ে। যদুর পরিবারের আর যে কেউ বেঁচে নেই। ততক্ষণে আমি ভোটার লিস্টের শেষ পাতায় পৌঁছেছি, ভোটার লিস্টের ছবি আর নাম যে একেবারে মিলে যাচ্ছে।

কিছু বুঝতে না পেরে এক দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ালুম ভেঙে পড়া যদুর বাড়ির উঠানে। উঠানের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে শাড়ি, জামা, যেগুলো বৃষ্টিতে ভিজলেও তার এতটাই উজ্জ্বলতা যে, সেগুলোকে দেখে কোনো কালেই মনে হবে না যে কেউ পরেছিল।

পুরো বাড়ির মধ্যে কেবলমাত্র একটি দেওয়ালের অর্ধেক দাঁড়িয়ে আর তার কুলুঙ্গিতে একটি ঠোঙা রাখা। গর্তের মধ্যে নানা উত্তেজনা নিয়ে ঠোঙাখানা হাতে নিতেই চারপাশের বাতাস যেন হঠাৎ করেই আমার কোন এক অজানা আচরণে রুষ্ট হয়ে আমার শরীরকে আষ্টেপৃষ্টে ধরলো আর সাথে সাথেই সেই শিউলি ফুলের গন্ধ। তার সাথে পুরুষ মানুষ, স্ত্রীলোক আর বাচ্চাদের করুণ আর্তনাদ, চারপাশের পরিবেশ থেকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। সে আর্তনাদ এতই তীক্ষ্ণ যে মাথার মধ্যের সমস্ত কোশগুলি তাদের কর্মক্ষমতা ক্ষণিকের মধ্যে হারিয়ে ফেললো।

কাঁধের ওপর একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করে চমকে উঠে পিছনে ফিরে দেখি ভঞ্জনবাবু। তিনি কিছু বলছেন, কিন্তু না, কিছুই শুনতে পারছি না। শরীর অসাড় হয়ে আসছে। পা আর শরীরের ভারকে ধরে রাখতে পারছে না। চোখের সামনে সারাটা আকাশ যেন অমাবস্যার অন্ধকারে ঢেকে গেল।

রাতে যখন চেতনা ফিরলো দেখলাম আমি স্কুলের ঘরের খাটে শুয়ে আছি। আর ঠিক আমার খাটের পায়ের ধারে একটি চেয়ারে বসে রয়েছেন ভঞ্জনবাবু। আমার জ্ঞান ফিরেছে দেখে ভঞ্জনবাবু একগ্লাস গরম দুধ খেতে দিয়ে বললেন — বাবু আপনি যদুর বাড়িতে অমন করে ছুটে গেলেন কেন? আর কেনইবা এমন উন্মাদের মতো চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেলেন?

কোনো উত্তর না দিয়ে ভঞ্জনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থ হয়ে বসে রইলুম।

কিন্তু! কি বলবো? আর আমি বললে কি তিনি বিশ্বাস করতেন? গত দুদিন আগের ঝড়-বাদলে যে যদুবাবুর মৃত্যু হয়েছে তিনি আমার ট্রেন যাত্রার সহযাত্রী ছিলেন। না, এ বিশ্বাস করা যায় না। কিভাবেই বা করবেন? যার একবার মৃত্যু হয় তিনি আর স্বশরীরে ফিরে আসতে পারেন না, যেটা আসে সে শরীর নয়, অশরীরী।

রুদ্ধশ্বাস নর্থ সিকিম

সুরজিৎ সাহা (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

২০শে অক্টোবর, ২০২৪ আমার এই কাহিনি লেখার সূত্রপাত ঃ—

আজ থেকে প্রায় মাস সাতেক আগে আমার মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজে ভ্রমণের আয়োজন হয়েছিল। আমরা সকল ছাত্র-ছাত্রী ও স্যারেরা একত্রিত হয়ে ঠিক করে ফেললাম ভ্রমণের স্থান হবে সিকিম আরও একটু স্পষ্ট করে বললে নর্থ সিকিম ও ইস্ট সিকিমের কিছু অংশ। বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গো ভ্রমণ সংক্রান্ত যাবতীয় বার্তালাপ হতে লাগলো....। শেষ পর্যন্ত 'ভিউ ট্রিপ' নামক এক ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গো আমাদের যাত্রা নিশ্চিত হল। কিন্তু, এখানে এলো এক সমস্যা... যেহেতু আমাদের এই ভ্রমণটি খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে ঠিকঠাক হয়েছিলো সেহেতু, ওই মুহূর্তে কোন দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট ছিল না। এই অবস্থায় আমাদের সকলের কাছে একটাই মাত্র পথ খোলা ছিল তা হলো সড়কপথে বাসে করে যাত্রা।

অনেকের শারীরিক সমস্যা হবে জেনেও আমরা রাজি হয়ে গেলাম বাসে করে ভ্রমণ করতে। যদিও, বাসে করে এতদূর পথে ভ্রমণ আমাদের অনেকের কাছেই ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতার রূপ। অবশেষে রওনার দিন ঠিক হলো ২০শে মার্চ, ২০২৪।

শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও ট্রাভেল এজেন্ট নিয়ে আমরা ছিলাম ২৫ জনের একটি গ্রুপ। গন্তব্যস্থলে যাওয়া নিয়ে অনেক আগে থেকেই আমাদের মজা, হৈহুল্লোড় ও এক অন্যরকম উত্তেজনা কাজ করছিল সকলের মধ্যে। অবশেষে, সিকিম যাত্রার সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসে উপস্থিত হল আমাদের সম্মুখে। ২০শে মার্চ বুধবার রাত্রি ৯-টার সময় আমাদের ভাড়া করা বাসে করে রওনা দিলাম বহরমপুর থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে। এখনো পর্যন্ত আমার জীবনে প্রথম এতখানি দূর পথে বাসে যাত্রা প্রায় ৮ থেকে ১০ ঘণ্টার অতিক্রম পথ। সারারাত্রি বাসের মধ্যে গান, গল্প ও মজা করতে করতে কখন যে সময় কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না!

পরের দিন ২১শে মার্চ বৃহস্পতিবার সকাল ৭-টায় কোনোরকম অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে আমরা সকলে সুস্থভাবে এসে পৌঁছালাম ১নং গন্তব্যস্থল শিলিগুড়ি বাসস্টপে। এই পর্যন্ত আমাদের যাত্রাপথ বেশ সুগম ও মসৃণ ছিল। তারপর সেখানে সকলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে প্রাতঃরাশ সেরে অপেক্ষা করতে থাকলাম আমাদের ২নং গন্তব্য সিকিম যাওয়ার উদ্দেশ্যে। প্রায় ঘন্টা দেড়েক পর আমাদের সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক যাওয়ার মিনি বাস এসে পৌঁছালো শিলিগুড়ি বাসস্টপে, আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। তড়িঘড়ি করে সকলে মিলে গ্যাংটক যাওয়ার বাসে চড়ে বসলাম। এবার শুরু হলো আমাদের আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথের যাত্রা। বাসের মধ্যে বেশ গান, গল্প, মজার মধ্যে দিয়ে সময় কাটছিল আমাদের। শিলিগুড়ি বাজারটা অতিক্রম করতেই চারিদিকের আকাশ ধূসর মেঘে ছেয়ে এল, কিছুক্ষণ পরে শুরু হল ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি, আমাদের এগোনোর সঙ্গো সঙ্গো বৃষ্টির পরিমাণও ক্রমশ বাড়তে থাকলো তার সঙ্গো মৃদুমন্দ উত্তুরে হাওয়ার দাপট বেশ ভালোই ঠান্ডা লাগতে আরম্ভ করল; সকলে

যে যার মত গরম পোশাক বার করে গায়ে দিয়ে বসলাম। সেই সঙ্গে বৃষ্টির জলের ঝাপটা থেকে বাঁচার জন্য গাড়ির জানলার কাঁচ নামিয়ে দিলাম। বাস ড্রাইভার তার নিজের ছন্দে আমাদেরকে নিয়ে বৃষ্টি ভেজা আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ ধরে ক্রমশ এগোতে থাকলো। হঠাৎ স্যারেরা বলে উঠলেন — 'সামনে মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি আসছে সকলে দেখিস।' সে এক অপূর্ব দৃশ্য; রাস্তার দুই ধারে খয়ের, শিশু এছাড়াও বিভিন্ন পাহাড়ি গাছ ও উদ্ভিদে পরিপূর্ণ। সময়টা ছিল বসন্তের তাই গাছের পুরনো পাতাগুলি ঝরে গিয়ে নতুন সবুজ কচি পাতা বেরিয়েছে যা মহানন্দা অভয়ারণ্যের শোভাকে আরো সুন্দর করে তুলেছে। সেই অভয়ারণ্যের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের আরেকটি পথ চলতি গন্তব্য সেবক সেতুতে, বৃষ্টি তখনও ঝিরিঝিরি পড়ছে। স্যারেরা গাড়ির ড্রাইভারকে বলে গাড়িটিকে কিছুক্ষণের জন্য সেবক সেতুতে দাঁড় করালো। শিলিগুড়ি থেকে রওনা দেওয়ার পর এই প্রথম আমাদের গাড়ি থামল সেবক সেতুতে। আমরা সকলে ছাতা নিয়ে নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে সেবক সেতু দেখার জন্য। বহমান তিস্তা নদীর ওপর এই সেতু নির্মাণ হয়েছে। সেই সেতুর ওপর থেকেই বহমান তিস্তার গতিপথ ও গতিবিধি পরিদর্শন করলাম। আর সেই সেতুর চারিধারে মাথা উঁচিয়ে পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে আর সেই পাহাড়ের মাঝে মাঝে মেঘের দল তাদের ইচ্ছেমতো খেলা দেখাচ্ছে। আমার মাথার ওপর ধূসর আকাশ, হালকা বৃষ্টির ছোঁয়া, উত্তুরে বাতাস, চারিদিকে সবুজ পাহাড়ের মাঝে সাদা মেঘের ভেলা, ঘোলাটে বহমান তিস্তা নদী, আর আমি সেই সেতুর মাঝে দাঁড়িয়ে সমস্তটা আমার দুই চোখ মেলিয়া শরীর জুড়ে উপভোগ করছি। সব মিলিয়ে সে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। সেই মুহূর্তে স্যার ডাক দিলেন; অনেকে হয়েছে দেখা, ছবি তোলা, এবার এসো গাড়িতে উঠে বসো। সেই স্থানেই একটি মন্দিরও ছিল 'মা সেবকেশ্বরী কালী মন্দির'। আমি ও আমার সহপাঠীরা মাকে দর্শন ও প্রণাম করে দ্রুত গাড়িতে উঠে বসলাম। আবার আমাদের পথ চলা শুরু হলো বৃষ্টিকে সঙ্গে নিয়েই। গাড়িটি বেশ ভালোই চলছিল তার নিজস্ব স্বচ্ছন্দ গতিতে। আমাদের আড্ডাও বেশ জমে উঠেছিল। এমন সময় গাড়ির ড্রাইভার হঠাৎ করে ব্রেক কষলো; আমি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতেই দেখি অজস্র গাড়ির দীর্ঘ একটি লাইন আর এখন সেই লাইনে আমরাও সামিল হয়েছি। গাড়ির দীর্ঘ লাইন দেখে বুঝলাম, আমাদের প্রায় ঘন্টাখানেক সময় ব্যয় হবে এই দীর্ঘ লাইন অতিক্রম করতে। সময় তখন প্রায় সকাল ১০-টা। স্থির গাড়িতে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর কারোর আর ভালো লাগছিলো না। আমাদের ট্রাভেল এজেন্ট গাড়ি থেকে নেমে দীর্ঘ লাইন ধরে এগিয়ে গেল কি সমস্যা হয়েছে তা জানার জন্য। আমরা তখনও গাড়ির মধ্যে বসে এই ভেবে যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে! আবার আমাদের গাড়ি আগের মত এগিয়ে যাবে গন্তব্যস্থল গ্যাংটকের দিকে। প্রায় আধ ঘন্টা পার হয়ে গেল এজেন্টের দাদা কোনোরকম খবর নিয়ে ফিরল না। আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন অবস্থায় চেয়ে রইলাম কি হয়েছে তা জানার জন্য। উদ্বিগ্নতা কাটানোর জন্য কিছুক্ষণ পরে আমাদের স্যারও গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেলেন কি হয়েছে তা সঠিকভাবে জানার জন্য। গাড়ির মধ্যে বসে থাকা আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা প্রচন্ড উৎসুক হয়ে পড়েছি ঠিক কি হয়েছে তা জানার জন্য। প্রায় এক ঘন্টা অচল গাড়িতে বসে থাকার পর আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম সেই পাহাড়ি রাস্তার মাঝখানে; নামতেই দেখি আমাদের গাড়ির সামনে ঠিক যতটা লম্বা লাইন আমাদের গাড়ির পেছনেও ঠিক ততটাই লম্বা গাড়ির লাইন। আমাদের সামনে-পেছনে সেই লম্বা গাড়ির দীর্ঘ লাইন দেখে বুঝলাম আরো ঘন্টাখানেক আমাদের এই রিয়াং স্টেশন [সড়ক পথ নং-NH 10]-এ আটকে থাকতে হবে। ঠিক সেই মুহূর্তেই সামনের দিক থেকে দেখি আমাদের এজেন্ট দাদা ও স্যার হন্তদন্ত হয়ে আমাদের

দিকে এগিয়ে আসছেন। স্যার কাছে আসতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম; স্যার কি হলো কোন খবর পেলেন? স্যার বলল, তাড়াতাড়ি গাড়িতে ওঠ বলছি, আমি গাড়িতে উঠে নিজের সিটে বসে পড়লাম। স্যার বলল — সবাই শোনো; দুর্ঘটনাবশত আমরা সকলে একটি দুর্যোগের মধ্যে আটকে পড়েছি। আমরা সকলে জানতে চাইলাম কি হয়েছে স্যার? স্যার বলল — আমরা এখন যেইস্থানে আটকে আছি সেই স্থান থেকে প্রায় দুই থেকে তিন কিলোমিটার দূরে অনবরত ভূমিধ্বস হচ্ছে। স্যার এও বললেন, এই স্থান থেকে কখন মুক্তি পাবো তা আমারও অজানা! সবকিছু ঠিকঠাক হতে দু'ঘন্টাও লাগতে পারে, আবার পাঁচ ঘন্টাও লাগতে পারে, আবার হয়তো ভূমিধ্বসের জন্য আজকে নাও খুলতে পারে এই রাস্তা! আমাদের এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। স্যারের এইরকম কথা শুনে আমরা সকলে হতবাক হয়ে গেলাম। মুহূর্তের মধ্যে সকলের হাসিখুশি চেহারাটা যেন এক বিষন্নতায় ছেয়ে গেল ঠিক বাইরের ধূসর ফ্যাকাসে আকাশের মতো। আমরা যেই সময় এই দুর্যোগের মধ্যে আটকে পড়ি ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক সকাল ১০-টা বেজে ৩০ মিনিট। এজেন্ট দাদা তখন আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, ভয় পাওয়া বা চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আমি আছি সঙ্গে স্যারেরা আছেন কি ব্যবস্থা করা যায় দেখছি। এই কথা শুনে আমাদের চিন্তা ও ভয় কিঞ্চিৎ ও কম হলো না। আমাদের সকলের মাথায় তখন একটাই ভাবনা আসছে যে এই ভ্রমণটা বাতিল হয়ে যাবে না তো! আমরা আমাদের গন্তব্যে ঠিকমতো পৌঁছাতে পারবো তো! এছাড়া আরো নানান প্রশ্ন আমাদের মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো। সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে ছিল অজানা। আমরা প্রায় সকলেই জীবনে প্রথম এইরকম দুর্যোগের সম্মুখীন হলাম। আমাদের সকলের মধ্যে তখন একটাই ভাবনা কাজ করছে এই দুর্যোগের হাত থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়? এর মধ্যেই আবার সকলের বাড়ি থেকে ফোন করে খবর নিতে আরম্ভ করেছে কতদূর পৌঁছালাম, সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। সবকিছু জেনেও আমরা বাড়িতে সত্যিটা বলতে পারলাম না; কেননা বাড়ির মানুষজন তখন দুশ্চিন্তা করবে। ততক্ষণে আমাদের ট্রাভেল এজেন্ট শুভ্রদা তার চেনা পরিচিত মানুষজনকে ফোন করে জানতে লাগলো এই পরিস্থিতি থেকে কি করে বের হওয়া যায়। সকাল গড়িয়ে দুপুর হতে চলল, তবুও আমাদের অবস্থার কোনরকম উন্নতি হলো না। প্রকৃতির এই ভয়ংকর রোষে আমরা সকলে অবরুদ্ধ। বেলা যত বাড়ছে আমাদের চিন্তাও তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে। বাইরে আবহাওয়ার অবস্থা খুব একটা ভালো নয়, ধূসর মেঘে আকাশ ছেয়ে আসছে যখন তখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামতে পারে আর বৃষ্টি নামলে ভূমিধ্বসের পরিমাণও হয়তো বাড়তে পারে। তখন হয়তো সারারাত আমাদের এই রাস্তাতে গাড়ির মধ্যেই কাটাতে হতে পারে। আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবারও নেই, স্বল্প কিছু শুকনো খাবার আছে তা দিয়ে বড়জোর বিকেল পর্যন্ত চলে যাবে। এই সমস্ত চিন্তা মাথায় নিয়ে আমাদের সময় পার হতে লাগলো। দুপুর তখন প্রায় ১-টা। হঠাৎ খবর এলো এই NH-10 জাতীয় সড়ক অনবরত ভূমিধ্বসের কারণে আজকে নাও খুলতে পারে! আমাদের ট্রাভেল এজেন্ট শুভ্র-দা ততক্ষণে চারিদিকে ফোনে জানতে শুরু করলো যে ঘুর পথে সিকিম যাওয়ার আর কোন রাস্তা আছে কিনা? চারিদিকে খোঁজ নিতে জানা গেল, রাস্তা আছে তবে তা অনেকটাই ঘুরে যেতে হবে। সেই মুহূর্তে আমরা ঘুর পথে যাওয়ার জন্য রাজি থাকলেও আমাদের গাড়ির ড্রাইভার ঘুরপথে যেতে কিছুতেই রাজি হলো না। তিনি বললেন, যদি যেতে হয় তবে এই পথ দিয়েই তিনি যাবেন তাতে যদি সারারাত অপেক্ষা করতে হয় তবে তিনি গাড়িতেই করবেন, তিনি এও বললেন, আমাদের যদি সমস্যা হয় তবে আমরা অন্য গাড়িতে ঘুরপথে যেতে পারি তবে তিনি কোনমতেই যাবেন না। ঐরকম দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় তার এ ধরনের কথাবার্তা শুনে আমাদের সকলেরই প্রচন্ড

রাগ হচ্ছিল কিন্তু কিছু করার ছিল না। দুপুর তখন প্রায় দুটো। সকলের খিদেও পেয়েছে প্রচন্ড। যার কাছে যা শুকনো খাবার ছিল তা বের করে খেতে আরম্ভ করলো। এমন সময় একটি পুলিশের গাড়ি আসতে দেখা গেল তাদেরকে দুর্যোগের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা বললো, আগের থেকে ভূমিধ্বসের পরিমাণ কিছুটা কমেছে এবং রাস্তা পরিষ্কার করার কাজ চলছে এই কথা শুনে আমরা কিছুটা স্বস্তি পেলাম হয়তো আমাদের সিকিম যাওয়াটা হবে এই স্থান থেকে আর ঘুরে যেতে হবে না। আমরা সেই স্থানেই অপেক্ষা করতে থাকলাম। দুপুর গড়িয়ে ক্রমশ বিকেল হতে থাকলো। রাস্তা আদৌ সেই দিনের জন্য খোলা হবে কিনা তার কোনো সঠিক উত্তর আমাদের কাছে এসে পৌঁছালো না। বিকেল তখন প্রায় ৪টের কাছাকাছি, চারিদিক ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে যদিও পাহাড়ে সন্ধ্যে তাড়াতাড়ি নামে। কোনরকম অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না দেখে সামনে ও পেছন থেকে একটি একটি করে গাড়ি ঘুরে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল। শুভ্রদা বলল, আমাদেরকেও শিলিগুড়ি ঘুরে যেতে হবে আর ঘন্টাখানেক পরে এই স্থানে আর থাকা যাবে না। আমরা সকলে হতাশ হয়ে পড়লাম। আমাদের সিকিম ভ্রমণটা হয়তো আর সম্পূর্ণ হলো না! শুভ্র-দা, সেই সময় আমাদের আরেকটা পরামর্শ দিল; সে বলল — আমাদের এই ভ্রমণটা এই দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার কারণে যদি ডুয়ার্সে পরিবর্তন করে নেওয়া যায়। কিন্তু, সেই পরামর্শে আমরা কেউই রাজি হলাম না কারণ, ডুয়ার্স ভ্রমণ আমাদের সকলেরই একবার হয়েছে। আমরা বললাম; যদি হয় তো একদিন শিলিগুড়িতে অপেক্ষা করে পরের দিন আবার সিকিমের উদ্দেশ্যে রওনা দেব আর তা সম্ভব না হলে একদম বাড়ি ফিরে যাব। শুভ্র-দা তখন বলল — বেলা অনেক হয়েছে সকলের খিদেও পেয়েছে আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক তারপর দেখছি কি হয়! কাছে ভিতে খাওয়ার কোনো দোকান ছিল না। অন্যান্যদের মতো আমাদের গাড়িও ঘুরে রওনা দিল আবার শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে, আমাদের সকলের মুখে তখন নিরাশার ছাপ। রিহাং স্টেশন থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে প্রায় দুই কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে রাস্তার ধারে একটি খাবারের দোকান চোখে পড়ল। শুভ্র-দা তখন গাড়ির ড্রাইভারকে থামিয়ে সকলকে বলল, টিফিন করে নেওয়ার জন্য। শরীরে ক্লান্তি ও মুখে হতাশার ছাপ নিয়ে আমরা টিফিন করলাম পেট শান্তি রাখার জন্য। আমাদের টিফিন শেষ হতেই ঘটলো এক ম্যাজিকাল ঘটনা, স্যার টিফিন করে বাইরে বেরোতেই দেখলো একটা দুটো করে গাড়ি সেই রাস্তা ধরে যাতায়াত করছে। স্যার দ্রুত ছুটে এসে আমাদের বললো মনে হয় রাস্তা খুলেছে। দু-একটা গাড়ি আমি যাওয়া-আসা করতে দেখলাম। তোরা তাড়াতাড়ি টিফিন করে গাড়িতে উঠে বস। এই কথা শুনে শুভ্র-দা জেনে বলল, হ্যাঁ স্যার রাস্তা খুলেছে কুড়িটি করে গাড়ি যেতে ও আসতে দিচ্ছে। এই খবর শুনে আমরা তো আনন্দে আত্মহারা। আমাদের অন্ধকার আশায় তখন কিছুটা আলোর রশ্মি যেন এসে পড়েছে। আমরা দ্রুত টিফিন সেরে গাড়িতে উঠে বসলাম এবং ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা সকলে পুনরায় রওনা দিলাম আমাদের গন্তব্য গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে, তখন বিকেল প্রায় ৫-টা বাজে। গাড়িতে করে প্রায় এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতেই চোখে পড়ল সেই বীভৎস ভূমিধ্বসের দৃশ্য, রাস্তার কিছুটা অংশ জুড়ে তখনও পাহাড় ধ্বসে পড়া অংশের স্তূপ সরানো হচ্ছে প্রশাসনের দ্বারা। আমাদের গাড়ি সেই পথ দিয়ে যখন অতিক্রম করছিল, তখন বেশ ভয় ভয় করছিল, সেই রাস্তাটুকু পার করতেই যেন কিছুটা স্বস্তি পেলাম। সেই দিনের মতো আর কোথাও গাড়ি থামেনি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে সিকিম ঢোকার মুখে কিছু সিকিম পুলিশ আমাদের গাড়ি থামিয়ে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ ও সবকিছু দেখে আমাদেরকে সিকিমের মধ্যে প্রবেশ করার অনুমতি দিল। অনেক বাধা ও বিপত্তি পেরিয়ে আমরা যখন গ্যাংটক পৌঁছালাম, তখন ঘড়ির কাঁটায় রাত্রি ১০-টা বাজে; যেখানে আমাদের পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল

দুপুর ১-টার মধ্যে। আমাদের বুকিং করা হোটেল কিন্স ডোকলাম রিট্রিট-এ পৌঁছে সকলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে দ্রুত রাতের ও দুপুরের খাবার খেয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ সকলে গল্প করছিলাম; তার মধ্যেই স্যার বলে উঠলেন আগামীকাল আমাদেরকে এই হোটেল ছেড়ে সকাল ৯-টার মধ্যে লাচুং (নর্থ সিকিম)-এর উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে। সকলে যে যার ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। যে যার ঘরে চলে গেলাম। বাইরে তখন বেশ ঠান্ডা। মোবাইলে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে দেখাচ্ছে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঘরে এসে ঘুম ঘুম চোখে ক্লান্ত শরীর নিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল হতেই জানলার কাঁচ ভেদ করে সোনালি সূর্যের মিষ্টি রৌদ্রের ছটায় আমি জেগে উঠলাম, জানালার কাঁচটা সরাতেই সেই মিষ্টি রোদের আলো আমার গায়ে মাখলাম ও নিজেকে কিছুটা গরম করে নিলাম। তা করতেই ঘরে চা দিয়ে গেল ও বলে গেল ৯-টার মধ্যে তৈরি হয়ে ব্যাগ-পত্র গুছিয়ে নিয়ে নিচে খাবার ঘরে চলে যেতে। সেই কথা মত আমিও চা খেয়ে নিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে একবারে ব্যাগ পত্র গুছিয়ে নিয়ে তিন তলা থেকে সোজা নিচে খাবার ঘরে চলে এলাম। একে একে আমার সব বন্ধুরাও এলো, সকলে মিলে একসঙ্গে প্রাতঃরাশ শেষ করতেই আমাদের গাড়ি চলে এলো নর্থ সিকিম (লাচুং) নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমাদের গ্যাংটকে কাটানো প্রথম রাতের হোটেল পরিত্যাগ করে আমরা দ্বিতীয় দিন (২২শে মার্চ, শুক্রবার) সকাল ১০-টার সময় রওনা দিলাম আমাদের পরের গন্তব্য লাচুং-এর উদ্দেশ্যে। রোদ ঝলমলে আবহাওয়া সঙ্গে আঁকাবাঁকা সবুজে ঘেরা পাহাড়ি পথের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে এগোতে থাকলাম। সেভেন সিস্টার ওয়াটারফলের নিকট আমাদের গাড়ি থামল। সেখানে গাড়ি থেকে নেমে আমরা সেই পাহাড়ি ঝরনা দেখলাম ও সেখানে ছবি তুলে পুনরায় গাড়িতে উঠে বসলাম। আবারও, পথচলা আরম্ভ হল। সিকিমের অপরূপ সৌন্দর্যে মোড়ানো সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে আমার মনে হচ্ছিল যেন মিশে যায় সেই পরিবেশেই। দুপুর ১-টা নাগাদ মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য পথ চলতি একটি হোটেলে আমাদের গাড়ি থামল ও আমরা সকলে সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নিলাম। তারপরে সিংঘিক ভিউ পয়েন্টে পৌঁছালাম। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। চারিদিকের পাহাড়ের চূড়াগুলি মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও তাঁদের মাথার ওপর সোনালি রোদের আলো খেলে বেড়াচ্ছে। তারপরে নাগা ওয়াটারফল দেখলাম। যদিও এর আরেকটি স্থানীয় নাম আছে তা হলো, অমিতাভ বচ্চন ওয়াটার ফল। যেহেতু এই ঝর্নাটি অনেকটা লম্বা, পাহাড়ের উচ্চ স্থান থেকে পড়ছে তাই তার এরকম নামকরণ করা হয়েছে। এই সমস্ত পথ চলতি অভিভূত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি পরিদর্শন করতে করতে আমাদের প্রায় বিকেল ৪-টে বেজে গেল। পথ চলতে চলতেই প্রায় ২ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে চোখে পড়ল ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে উত্তরবঙ্গে ঘটে যাওয়া সেই বিপর্যয়ের ভয়ংকর দৃশ্য। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে লোনাক লেক ফেটে পাহাড়ের ঢাল বেড়ে জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইতে থাকে এবং চুংথাং ড্যাম ধ্বংস করে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়। সেই ধ্বংসলীলার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ড্যামের ভাঙ্গা অংশ, ফাটল ধরা রাস্তা ও পাহাড়ের ঢালে বিপজ্জনক অবস্থায় হেলে থাকা জনপ্রাণীহীন কিছু বাড়ি চোখে পড়ে। সেই স্থান থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পাহাড়ে ওঠা আমার কাছে খুবই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির রূপকে তুলে ধরে থাকা কাঁচামাটির রাস্তা, কাঠের গুঁড়ি ও তার সঙ্গে কিছু কাঠের পাটাতন দিয়ে কোনরকমে পার হওয়ার মতো বাঁধানো সেতু আর তার সামান্য নিচে দিয়ে অনবরত বয়ে চলেছে গর্জনকারী ভয়ানক বীভৎস তিস্তা নদী। আবার, কোথাও দূর পাহাড় থেকে মাঝারি ধরনের বোল্ডার গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। এই সমস্ত দুর্গম ও বিপজ্জনক বাধাকে অতিক্রম করেই আমরা লাচুংয়ে পৌঁছালাম

তখন ঘড়ির কাঁটায় প্রায় রাত্রি ৮-টা। গাড়ির ভেতর থেকে বাইরে বেরোতেই প্রচন্ড ঠান্ডা অনুভব করলাম। উত্তরের শীতল বাতাস ক্রমশ হাড় হিম করে দিচ্ছে সেই সময় হালকা বৃষ্টিও পড়ছিল। মোবাইলে আবহাওয়ার খবরে চোখ রাখতেই দেখি তাপমাত্রা তখন ৩ ডিগ্রি। দ্রুত আমরা সকলে হোটেলের ভেতরে প্রবেশ করলাম ও পরিষ্কার হয়ে টিফিনের অপেক্ষা করতে থাকলাম। প্রায় এক ঘন্টা পর আমাদের ঘরে ঘরে টিফিন দিয়ে গেল। টিফিন করে নিয়ে আমরা সকলে মিলে জমিয়ে গান, গল্প ও মজা করতে লাগলাম। রাত্রি ১০ঃ৩০ বাজতেই খবর এলো রাত্রের খাবার হয়ে গেছে সকলে খেয়ে যাও। আমরা সকলে মিলে খাবার স্থানে চলে গেলাম ও একসঙ্গো খাওয়া-দাওয়া করে নিলাম। খাওয়া শেষ হতেই শুভ্র-দা বলল, আগামীকাল আমাদের সকাল ৭-টার মধ্যে দর্শনীয় স্থানাদি দর্শনের জন্য বেরিয়ে পড়তে হবে, দেরি করা একদম চলবে না। যেহেতু আমরা বরফাবৃত পাহাড়ে যাব তাই সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ায় ভালো হবে আমাদের জন্য; নয়তো বেলা বাড়লে আবহাওয়া ক্রমশ খারাপ হয়ে পড়বে। আগামীকাল আমরা প্রাকৃতিক বরফ দেখতে পাবো এই আশা নিয়ে সকলে ঘরে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ করে মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙ্গো গেল। ঘড়িতে তখন প্রায় তিনটের কাছাকাছি। গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে একটু ব্যালকানিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। শিহরণ দেওয়া ঠান্ডা বাতাস তখন গায়ে কাঁটার মত লাগছে। মোবাইলের আবহাওয়া পূর্বাভাস দেখলাম। তাপমাত্রা তখন ১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আমি দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন ২৩শে মার্চ, শনিবার, সকাল ৬-টার সময় মোবাইলে দেওয়া এলার্ম-এর শব্দে ঘুম ভাঙলো। দ্রুত বিছানা ছেড়ে উঠে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতেই ঘরে ঘরে চা-বিস্কুট দিয়ে গেল এবং বলে গেল ব্যাগপত্র গুছিয়ে রেখে তৈরি হয়ে নিচে নেমে প্রাতঃরাশ সেরে নেওয়ার জন্য। তারপর চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে ব্যালকনির দিকে গেলাম। ব্যালকনিতে গিয়ে দেখি সে এক চোখ ধাঁধানো প্রাকৃতিক দৃশ্য। চোখের সামনেই অজস্র মেঘের ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে, কখনো তারা সবুজ পাহাড়কে ঢেকে ফেলছে, কখনো আবার সরে যাচ্ছে। মেঘের দলের এই নিরন্তর খেলা আমি এক কাপ চা হাতে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছি। তা করতেই দূরে বরফাবৃত পাহাড় চূড়া চোখে পড়ল, আমি আনন্দে উত্তেজিত হয়ে সেই অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখানোর জন্য সকলকে ব্যালকনিতে ডাকলাম ও সকলে এসে সেই দৃশ্য উপভোগ করল। তারপরে আমরা আমাদের ব্যাগ গুছিয়ে রেখে তৈরি হয়ে নিচে নেমে প্রাতঃরাশ করতেই আমাদের গাড়ি এসে হাজির। আমরা সকলে গাড়িতে উঠে বসলাম এবং গাড়ি রওনা দিল কাটাওয়ের উদ্দেশ্যে; ঠিক যে জায়গাটা আমি আমার হোটেলের ব্যালকনি থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার শরীরের মধ্যে এক অন্যরকম আনন্দ উত্তেজনা কাজ করছিলো। গাড়িতে করে কিছুক্ষণ যেতেই চারিদিক ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে গেল, চারিদিক শুধু সাদা আর সাদা। তার মধ্য দিয়েও ড্রাইভার দাদারা দক্ষতার সঙ্গো গাড়ি চালিয়ে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল। প্রায় ঘন্টাখানেক পথ অতিক্রম করতেই আমরা রাস্তার ধারে ও পাহাড়ের গায়ে জমে থাকা বরফের স্তুপ দেখতে পেলাম। আরও কিছুটা পথ এগোতেই দেখি ঝিরিঝিরি তুষারপাত হচ্ছে এই দৃশ্য দেখতে আমাদের গাড়ি এসে থামলো কাটাওতে। গাড়ি থেকে নামলাম তখনও ক্রমশ তুষারপাত হয়ে চলেছে। জীবনের প্রথম তুষারপাত ও বরফাচ্ছন্ন পাহাড়ের ছোঁয়া নিলাম আমার শরীর জুড়ে। এই মুগ্ধকর পরিবেশে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছিল আমার। সেখানে আমরা সকলে বরফের গোলা বানিয়ে একে অপরকে ছুঁড়ে বাচ্চাদের মতো খেলা খেলতে লাগলাম। আমাদের সঙ্গো স্যারেরাও যোগ দিলেন, সকলে মিলে সেই বরফে ঢাকা পাহাড়ের কিছুটা অংশ ঝুঁকি নিয়ে, সাবধানে উঠে পড়লাম ও মজা করতে

লাগলাম। যেহেতু, সেইখানে অক্সিজেনের মাত্রা খুবই কম তার সঙ্গে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে এবং বরফে আমাদের অনেকের জামাকাপড় প্রায় ভিজে গিয়েছিলো, তাই আমরা সেই স্থানে খুব স্বল্প সময় অতিবাহিত করে বেরিয়ে পড়লাম ইয়ংথং ভ্যালির উদ্দেশ্যে। ইয়ংথং ভ্যালি যাওয়ার পথে আমাদের স্বল্পকালীন বৃষ্টির সম্মুখীন হতে হয়েছিল ও আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ, পরিবেশগত পার্থক্যের কারণে অনেকের গাড়িতে বমিও হয়েছিল। এইসব ছোটোখাটো বাধা কাটিয়ে আমরা ইয়ংথাং ভ্যালিতে এসে উপস্থিত হলাম এবং সেখানকার বরফে মোড়ানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। সেখানে কিছুটা সময় অতিবাহিত করতেই আমাদের অনেকের শরীরে অক্সিজেনের সমস্যা হতে শুরু করেছিল, বেশিক্ষণ না থেকে সেখান থেকে আমরা রওনা দিলাম আমাদের লাচুং হোটেলের উদ্দেশ্যে। সকাল ১১-টার সময় আমরা লাচুং-এ ফিরে এলাম। ফিরে আসতেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে গোছানো ব্যাগপত্র নিয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে প্রায় দুপুর ১-টার দিকে রওনা দিলাম গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে। যে ভয়াবহ, বিপর্যস্ত ও দুর্গম পথ দিয়ে লাচুং-এ এসেছিলাম আবার সেই পথ অতিক্রম করেই গ্যাংটকে এসে পৌঁছলাম, তখন প্রায় রাত্রি ৯-৩০ বাজে। গ্যাংটকের হোটেলে পৌঁছে সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে সকলের শরীর প্রায় ক্লান্ত। এমন সময় শুভ্র-দা বলল, আমাদের মনে হয় আগামীকালের যাত্রাটা সম্পূর্ণ হবে না কারণ, অতিরিক্ত তুষারপাতের ফলে রাস্তায় বরফ জমে গিয়েছে, রাস্তা বন্ধ, ২৯ মাইল পর্যন্ত রাস্তা খোলা আছে, যাওয়ার অনুমতি এখনো পাইনি। শুভ্র-দার এই কথা শুনে আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম। স্যার বলল, হতাশ হওয়ার কিছুই নেই, পরিষ্কার হয়ে সকলে খাবার টেবিলে এসে রাতের খাবার খেয়ে নাও। আমরা রাতের খাবার খেয়ে উঠতেই শুভ্র-দা বললো, আগামীকাল সকাল ৯-টার মধ্যে সবাই তৈরি থেকো বেরোতে হবে, যতটুকু দেখা সম্ভব হবে ততটুকু দেখেই ফিরে আসবো। আমরা সকলে নিজের নিজের ঘরে গিয়ে ক্লান্ত শরীর নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন, ২৪শে মার্চ, রবিবারের সকালে হঠাৎ দরজা খট-খটের শব্দে আমার ঘুম ভাঙলো। বাইরে থেকে একজন দাদা বলে উঠলো দরজা খোলো, চা-টা নিয়ে নাও। আমি ঘুম ঘুম চোখে দরজাটা খুলে চা নিলাম তখনই দাদা বললো, এক ঘণ্টার মধ্যে নিচে নেমে এসো কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমাদের গাড়ি চলে আসবে, সকাল আটটার আগে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। তা করতেই, শুভ্র-দা আমাদেরকে শুভ খবরটা দিতে চলে এলো। গতকাল পর্যন্ত যে রাস্তা বন্ধ ছিল আজকে রোদ ঝলমলে আবহাওয়ার কারণে সেই রাস্তা খুলে গেছে এবং আমাদের যাওয়ার অনুমতিও হয়ে গেছে। এই খুশির খবর শুনে আমরা শীঘ্রই তৈরি হয়ে খাবার বেঁধে নিয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম আমাদের সেই দিনের দর্শনীয় স্থানাদি দর্শনের জন্য। পরিষ্কার আবহাওয়া থাকার কারণে চলতি পথে আমরা ইস্ট সিকিম থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার নৈসর্গিক দৃশ্য দর্শন করলাম। তারপর একটি পথ চলতি দোকানে থেমে বরফে পরার জুতো পরে নিলাম। সেখানেই আমাদের বেঁধে নিয়ে আসা খাবার খাওয়ার পর আমাদের গাড়ি তখন নাথুলা পাসের উদ্দেশ্যে এগোতে থাকলো। হঠাৎ করে কিছু ভারতীয় সেনা আমাদের গাড়ি থামালো এবং আমাদের যাবতীয় তথ্য দেখে আমাদের অন্য রাস্তা দিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার বলল, এই রাস্তা অনুসরণ করলে প্রথমে আমাদের সিকিমের জনপ্রিয় হরভজন সিং বাবা মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে। তারপরে ছাঙ্গু লেক ও শেষে নাথুলা পাস পরিদর্শন করতে হবে। আমাদের গাড়ি তখন রাস্তা পরিবর্তন করে বাবা মন্দিরের দিকে এগোতে থাকলো। বাবা মন্দির ঢুকতেই চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ, রাস্তার দুই ধারে বরফের স্তূপ জমে আর সেই বরফের ওপর সূর্যের আলো পড়াতে চারিদিক এতটাই ঝলমল হয়ে

উঠেছে যে, খালি চোখে তাকানো যাচ্ছে না। চারিদিকে নীল আকাশের নিচে বরফাবৃত পাহাড়; তাদেরই মাঝে আমাদের জাতীয় পতাকা গৌরব ও মর্যাদার সহিত উড়ছে। বাবা মন্দির পরিদর্শন করে আমরা রওনা দিলাম ছাঙ্গু লেক ও ভারত-চীন বর্ডার নাথুলা পাসের উদ্দেশ্যে। আমাদের ড্রাইভার বলল, এবার নাথুলা পাস যাব কারণ, নাথুলা পাস অধিক উচ্চতা যুক্ত অংশ (প্রায় ১৪ হাজার ৪৫০ ফুট) এবং ফেরার পথে ছাঙ্গু লেক দেখে ফিরব যেটি (প্রায় ১২ হাজার ৪০০ ফুট) উচ্চতা বিশিষ্ট। আমাদের গাড়ি নাথুলা পাসে গিয়ে থামলো। আমাদের কিছুজন গাড়িতেই বসে রইল আর আমি তার সঙ্গো কিছু বন্ধু আমরা গাড়ি থেকে নেমে হাতে কর্পূর নিয়ে নাথুলা পাস (ভারত-চীন বর্ডারের নিকটবর্তী অংশ ও যাতায়াত মাধ্যমের পথ) দেখার জন্য ক্রমশ এগিয়ে গেলাম। সেখানের পরিবেশে অক্সিজেনের মাত্রা খুবই কম থাকার কারণে প্রায় ৪৫ মিনিটের মধ্যেই আমরা আমাদের গাড়ির কাছে ফিরে আসতেই শুনি ঘোর বিপদ হয়ে গেছে। গাড়িতে বসে থাকা কিছু বন্ধুর অক্সিজেন কম থাকার কারণে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে ও দ্রুত তাদেরকে অন্য আরেকটি গাড়িতে করে নিচে অর্থাৎ ছাঙ্গু লেকের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই খবর শুনে আমি ক্রমশ অস্থির হয়ে পড়ি। কেন জানিনা বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। আমার সেই অস্থিরতা দেখে স্যার বললেন, ভয় পাওয়া বা ভেঙ্গে পড়ার মতো কিছু হয়নি, সব ঠিক আছে, চিন্তা করোনা। সেই সময় আমার একটাই কথা মনে হচ্ছিল, এতদূর পথে এসে কারোর যেন কোনো বিপদ না হয়, সবাই যেন সুস্থভাবে বাড়ি ফিরতে পারি। ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করতে করতেই আমাদের গাড়ি ছাঙ্গু লেকের দিকে রওনা দিলাম। দ্রুত ছাঙ্গু লেকে পৌঁছে সেই বন্ধুকে সুস্থ দেখে কিছুটা স্বস্তি পেলাম ও ভগবানকে ধন্যবাদ জানালাম সবকিছু ঠিক রাখার জন্য। ছাঙ্গু লেকে চামরী গাই-এর পিঠে চড়ে ছবি তুললাম ও তার পাশেই থাকা মহাকাল মন্দির দর্শন করলাম। দুপুর ২-টোর সময়ে আমরা ছাঙ্গু লেক থেকে রওনা দিলাম আমাদের হোটেল গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে। আজকের এই যাত্রাটা আমাকে এক ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করেছিল। গ্যাংটকের হোটেলে পৌঁছালাম তখন প্রায় দুপুর ৩-৩০ বাজে। পরিষ্কার হয়ে সকলে মধ্যাহ্ন ভোজন করে নিলাম, তারপর ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় বেরিয়ে পড়লাম গ্যাংটক এম. জি. মার্গ পরিদর্শন ও কেনাকাটা করতে। মার্কেটে পৌঁছোতেই দেখি চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। সাজানো গোছানো জমজমাট মার্কেট। সমস্ত মার্কেটটা ঘুরে দেখার পর হাতে এক কাপ সিকিমের চা নিয়ে একটি বেঞ্চে বসে সেই পরিবেশটাকে উপভোগ করতে থাকলাম। কিছুক্ষণ পরে খানিকটা দূরে দেখি একগুচ্ছ মানুষের ভিড়। এক পা দুই পা করে সেই ভিড়কে অনুসরণ করে এগোতে থাকি এবং দেখি যে, সেখানের কিছু স্থানীয় মানুষজন রঙিন আবির হাতে গানবাজনার সহিত বসন্ত উৎসবে মেতে উঠেছে। আমি ও কিছু বন্ধু তাঁদের সামনে যেতেই আমাদেরকেও একটু রঙ মাখিয়ে সেই উৎসবে সামিল করে নিল। আমরাও খুব উৎফুল্লতার সঙ্গো সেই সুমধুর মুহূর্তটাতে মজা করে কাটালাম। রাত্রি প্রায় ৮-৩০-এর সময় আমরা এম. জি. মার্গ থেকে হোটেলে ফিরে এলাম।

হোটেলে ফিরে রাত্রের খাবার খেয়ে নিলাম। আমাদের ট্রাভেল এজেন্ট শুভ্র-দা বলল, আগামীকাল আমাদের শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে সকাল সকাল রওনা দিতে হবে কারণ, যেই রাস্তা দিয়ে আমরা গ্যাংটক এসেছিলাম, সেই রাস্তা অতিরিক্ত ভূমিধ্বসের কারণে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ; তাই আমাদেরকে অনেকটা ঘুর পথে শিলিগুড়ি পৌঁছতে হবে, তাই তোমরা আগামীকাল সকাল ৯-টার মধ্যে ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিয়ে সবাই তৈরি থাকবে আমাদেরকে এই হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। শুভ্র-দার কথামতো পরের দিন ২৫শে মার্চ, সোমবার সকাল ৯-টার মধ্যে আমরা গ্যাংটকের হোটেল ছেড়ে রওনা দিলাম শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে। শিলিগুড়ি ফেরার সময় মাঝপথে আবারও

এক শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হলাম। আমাদের মধ্যে একজন বন্ধু হঠাৎ করে বমি ও পেটের সমস্যায় কাতর হয়ে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। আমাদের গাড়ি তখন কালিম্পং জেলার তারখোলা অঞ্চলে এসে পৌঁছেছে। বন্ধুটির শারীরিক অবস্থার এইরকম অবনতি দেখে স্যারেরা তাকে নিয়ে রংপো হসপিটাল-এর উদ্দেশ্যে রওনা দিল এবং আমরা তখন সেই অঞ্চলে আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ সম্পূর্ণ করে ফেললাম। সেই বন্ধুটির চিকিৎসা করে ফিরতে প্রায় দুপুর ১২-টা বেজে গিয়েছিল। সেই সময়টুকুর মধ্যে আমরা আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজটিও সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলাম। তারপর সেখানেই একটি হোটেলে মধ্যাহ্নভোজন সেরে আমরা পুনরায় রওনা দিলাম। যেহেতু সেদিন হোলি ছিল তাই দার্জিলিং-এর তিনচুলে নামক একটি পাহাড়ি অঞ্চলে আমাদের গাড়ি থামল ও আমরা সেই পাহাড়ি অঞ্চলে নানা রাঙা আবির হাতে 'পাহাড়ের কোলে বসন্তের নেশায়' মেতে উঠলাম। আমাদের সঙ্গে স্যারেরাও সামিল হলেন ও সে আনন্দে আমাদের সকলকে মিষ্টিমুখ করালেন। কিছুটা সময় সেই স্থানে অতিবাহিত করে বৈচিত্র্যপূর্ণ সৌন্দর্যময় চা বাগানের দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা শিলিগুড়ি বাসস্টপে এসে পৌঁছলাম, তখন বিকেল প্রায় ৫-টা। শিলিগুড়ি থেকে আমাদের বহরমপুর যাওয়ার গাড়ি ছিল রাত্রি ৯-৩০-এর সময়। এই সময়টুকু আমরা শিলিগুড়ি বাসস্টপে বসে গল্প করে কাটিয়ে ফেললাম। রাত্রি ৮-টা বাজতেই সেইখানের একটি হোটেলে আমরা রাত্রের খাবার খেয়ে আমাদের বুকিং করা বাসে চড়ে বসলাম। বাস ছাড়ার আগেই শুরু হল মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের ঝলকানি ও তার সঙ্গে শিলাবৃষ্টি। কিছুক্ষণ পরে তা থামতেই আমাদের গাড়ি ৯-৩০-এ শিলিগুড়ি থেকে রওনা দিল।

২৬শে মার্চ, মঙ্গলবার সকাল ৭-টার সময় আমরা আমাদের জীবনর পাতায় নর্থ সিকিম সফরের একটি রোমাঞ্চকর, দুর্ধর্ষ ও ভয়ংকর সুন্দর স্মৃতি নিয়ে সুস্থভাবে বহরমপুরে অবতরণ করলাম।

ভোরের আলো

ধীরাজ সেন (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

সকালবেলা বলেই, বা কলকাতার আবহাওয়ার জন্য, আকাশকে মেঘ ঢেকে রেখেছে, আর সেই মেঘ সূর্যকে আড়াল করে রেখেছে, স্নান করে ভাবলাম, রোদে বসবো; কিন্তু মেঘের কারণে সূর্যের আলো এখনও মাটিতে পৌঁছায়নি। ঘরের মধ্যেই বসে আছি। জানালা দিয়ে, মাঝে মধ্যে মিষ্টি ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগছে; তাতেই শরীরটা শিউরে উঠছে। কিছুক্ষণ পর, দেখি মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য উঁকি মারছে। সূর্যকে দেখামাত্র, ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এলাম ঘরের সামনাসামনি থাকা পুকুরের কাছে। যেখানে সূর্যের আলো সুন্দরভাবে এসে পড়েছে, সেখানেই বসে পড়লাম। প্রভাতের ঠান্ডা বাতাস আর কোমল সূর্যকিরণ, শরীর ও মনে এক অন্যরকম প্রশান্তি এনে দিচ্ছে।

এই সময়, পুকুরের অন্য পাড়ে, প্রাপ্ত বয়স্করা শরীরচর্চায় ব্যস্ত। তাদের মধ্যে, কেউ স্কিপিং দড়ি দিয়ে খেলছে, কেউ বা বিভিন্ন রকম অঙ্গভঙ্গি করে অন্যকে দেখাচ্ছে। মহিলারা, ঘর থেকে হেঁটে এসে, পুকুর পাড়ে বসে গল্প করছে। যারা মাঝবয়সী, তারা নির্দিষ্ট ব্যবধান মেনে হেঁটে আসছে, আবার যাচ্ছে। আর যারা কমবয়সী, তারা পুকুর থেকে কিছুটা দূরত্বে অবস্থিত মাঠে ফুটবল খেলছে।

পুকুরের ঠিক উপরে, কিছু পাখি একে অপরকে অনুসরণ করে, গোল গোল ঘুরছে। তারপর কোন দিকে যাবে, ঠিক করে, হঠাৎ ডানা মেলে দূরের আকাশে উড়ে যাচ্ছে। পুকুরের ব্যাঙগুলো, জলের উপরে ছোট ছোট তরঙ্গ সৃষ্টি করছে। কখনও বড়ো তরঙ্গ দেখা যায়, যখন জলের নিচে লুকিয়ে থাকা মাছ, হঠাৎ ভেসে উঠে, ভাসমান কোনো পোকামাকড় ধরে, তারপর নিজের লেজ দিয়ে জল ছিটিয়ে, আবার তলিয়ে যায়।

যখন হাওয়ার দাপট বাড়ছে, তখন মনে হচ্ছে, পুকুরের একধারের জল, একে অপরকে ঠেলে বলছে — "চল ভাই, একবার ওই দিকটা ঘুরে আসি।" পুকুর পাড়ে, সারিতে লাগানো বিভিন্ন ধরনের গাছগুলো, বাতাস ও সূর্যরশ্মিতে একদল তরতাজা হয়ে উঠেছে। সূর্য না ওঠা পর্যন্ত, তারা চিৎকার করে বলছিল, "দাও গো, একটু আলো দাও।" এখন তারা স্বস্তি পেয়েছে, এবং খুশি মনে নাচছে, আর গান গাইছে —

ঘাড় দোলায়,
হাওয়ায় ঘাড় দোলায়,
পা নেই তবুও
আলোয় নেচে বেড়ায়।
ঘাড় দোলায়,
আলোয় ঘাড় দোলায়,
ডানা নেই তবুও
হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়।

শান্তি বোমা

দেবোত্তম দাস (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

চরিত্রায়ণ ঃ— মূলচরিত্র ঃ হিরক রাজা, বোম্বাগড়ের রাজা, হাল্লার রাজা, শুন্ডির রাজা, বিদুষক, দূত, সভাসদগণ, দূত, উদয়ন পন্ডিত, ফেলুদা, তোপসে, জটায়ু, গুপী গায়েন, বাঘা বায়েন, পাগলা দাশু, প্রোফেসর শঙ্কু, বিজ্ঞানী।

কতৃজ্ঞতা ঋণ ঃ— উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়।

দৃশ্য — ১

[পর্দা উন্মোচিত হলো। স্পটলাইটের নীচে সিংহাসন পাতা। বসে আছেন হিরক রাজা। পাশে বিদুষক। সিংহাসনের সামনে মঞ্চের বাম ও ডান পাশে বসে হিরক রাজার সভাসদগণ।]

হিরক রাজা ঃ আহা কি চিন্তার কথা!
দূতের জন্য হচ্ছে মাথাব্যথা।
এত আনন্দ এত আলোর স্পর্শ,
একটি সংবাদে সব হবে নষ্ট।

বিদূষক ঃ কেন এই কথা জাঁহাপনা?
আছে কি বিশেষ প্ররোচনা?

হিরক রাজা ঃ প্ররোচনা নয় গো বিদূষক,
ও আসলে সংবাদ প্রেরক।
ভালো খবর যদি হয় হবে,
খারাপ কিছু হলে হায়
ভাবতে হবে যে উপায়।
ঠিক কিনা —

সভাসদগণ ঃ ঠিক ঠিক ঠিক।

হিরক রাজা ঃ ঠিক কিনা —

সভাসদগণ ঃ ঠিক ঠিক ঠিক ঠিক।

[এমত অবস্থায় বাম উইংস দিয়ে দূতের প্রবেশ।]

দূত ঃ মহারাজা। হয়েছে ভীষণ আপদ,—
শুনছি নাকি এবার হবে যুদ্ধের শপথ।
তাই নিয়ে বোম্বাগড়ের রাজা গদ্‌গদ্ —
ভাবনাটা এমন হলে আছে কোনো পথ?

হিরক রাজা ঃ কাম সারছে! ওরে শোন্ তবে —
এক্ষুনি আমার কাছে বিজ্ঞানীকে আনতে হবে।
আর হ্যাঁ। অতিসত্ত্বর ভাই,
না হলে কারো নিস্তার নাই।

বিদূষক ঃ [দূতকে উদ্দেশ্য করে] দেরী করো কেন?
যাও ডেকে আনো।

[দূতের প্রস্থান]

হিরক রাজা ঃ যত সব উটকো ঝামেলা। যত্তসব কষ্ট।
মগজাস্ত্রটা দিলো মাথা করে নষ্ট।
বিজ্ঞানী যদি না করে উপায়
তা হলে নিস্তার নাই নিশ্চয়।
ঠিক কিনা, —

সভাসদগণ ঃ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্।
ঠিক ঠিক ঠিক।

[বাম উইংস দিয়ে দূতের সঙ্গে বিজ্ঞানীর প্রবেশ]

বিজ্ঞানী ঃ আজ্ঞে জাঁহাপনা,
আছে আলোচনা?

হিরক রাজা ঃ তা তো আছে নিশ্চয় —
নইলে কি ডাকা হয়?
শোনো। বোম্বাগড়ের রাজা যুদ্ধ চায়।
এখন রদ করার আছে কি উপায়?

বিজ্ঞানী ঃ নিরূপায় এখনই নয় মহারাজ,
আমার হাতে অনেক কাজ।
এগুলো শেষ হলে তবে,
শঙ্কুকে একবার ডাকতে হবে।

হিরক রাজা ঃ সে দেখা যাবে'ক্ষণ
বলে যাও দিনক্ষণ।

বিজ্ঞানী ঃ এত তাড়াতাড়ি সম্রাট?
আমার এখন বালাই ষাট।

[স্পটলাইট অফ হলো।]

দৃশ্য — ২

[স্পট লাইট অন হলো। স্পট লাইটের নীচে সিংহাসনে বোম্বাগড়ের রাজা। তার কোলে মন্ত্রী]

বোম্বাগড়ের রাজা ঃ হা হা হা দারুণ পাচ্ছে হাসি,
মনে পাচ্ছি এক প্রশান্তি।
যুদ্ধ করে নতুন জমি,
হকচকিয়ে নেবো যে আমি।
হিরক রাজা কুপোকাত,
আমাদের বাজিমাত।

মন্ত্রী ঃ (কলসি বাজাতে বাজাতে)
দুম দুমাদুম মারছি দ্যাখো, আনন্দেতে কলসিটা,
ভাবছি এবার জমবে ভালো, সাজানো এই যুদ্ধটা।
জিতব এবার দারুণ ভাবে সবকিছু দুড়মুড়িয়ে,
দেখবে বটে হিরক রাজা, পালাবে হড়বড়িয়ে।
নতুন করে ফাটবে হুদাই আনন্দেতে কলজেটা
ভাবছি তো তাই জমবে খাসাই, সাজানো এই ফুর্তিটা।

[বাম উইংস দিয়ে পাগলা দাশুর প্রবেশ]

পাগলা দাশু ঃ লোকে আমাকে পাগল বলে ঠিকই। আমি দাশু। আমাকে নিয়ে সাহিত্যিক সুকুমার রায় মজার মজার গল্প লিখতেন। সারা বিশ্ব ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে এলাম।

[ধীরে ধীরে স্পট লাইটের নীচে]

আচ্ছা এখানে আপনাদের এত উল্লাস হচ্ছে কেন? কারণটা কী? কিছুই তো বুঝলাম না। মনে হচ্ছে আপনারা পাগলই হয়ে গেছেন। আর আপনারা কি আজব!

[কিছুক্ষণ বোম্বাগড়ের রাজা ও মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে..... দৈহিক ভঙ্গিটা কিন্তু দর্শকের দিকে থাকবে।]

আপনারা কেমন তরো রাজা আর মন্ত্রী হে! রাজার কোলে মন্ত্রী বসেছে। সে আবার কলসি বাজায়! কি তাজ্জব ব্যাপার!

মন্ত্রী ঃ (কলসি বাজাতে বাজাতে)
এটাই মোদের সংস্কৃতি ভাই, এটাই মোদের গুণ,
বোম্বাগড় রাজ্যটাই তাই তো এত নতুন।
আমরা এবার নতুন করে যুদ্ধতে যুদ্ধতে,
থাবা বসাবো নতুন ভাবে হিরক রাজ্যতে।

বোম্বাগড়ের রাজা ঃ হা হা হা। হচ্ছে মজা খুব উল্লাসে,
হঠাৎ যুদ্ধে হবে ক্ষতি ওদের সৈন্যতে।

পাগলা দাশু ঃ (জনান্তিকে) মনে হচ্ছে আমি নয়, ওরাই পাগল। কি আজব! যুদ্ধতে এরা এত আনন্দ পাচ্ছে কেন? রাজ্য দখল কি শুধুই কাজ? সে তো মধ্যযুগীয়। অবশ্য এখনই বা কতটা গণতান্ত্রিক? শুধুই দেখানোটাই আসল কাজ। আর কিছু না!

[এই সময় স্পট লাইট পাগলা দাশুর উপর জ্বলবে নিভবে]

(হাসতে হাসতে, প্রকাশ্যে) তা যুদ্ধ করে মধ্যযুগীয় বিজয়ের উল্লাস তো আজকের তামাশার মতো। হা হা হা।

[স্পট লাইট নিভে গেল]

[আবার স্পট লাইট অন হলো। স্পট লাইটের নীচে জোড়া সিংহাসন। বসেছেন বৃদ্ধ শুন্ডি আর হল্লার রাজা]

[দুজনের মাথা নীচু]

[বাম উইংস দিয়ে পাগলা দাশুর প্রবেশ]

পাগলা দাশু ঃ প্রণাম হই মহারাজগণ। কেমন আছেন?

হল্লার রাজা ঃ (নত মস্তক উন্নত করে) ঐ তো কেটে যাচ্ছে কাল। তোমার খবর কেমন?

পাগলা দাশু ঃ আপনাদের দয়ায় হুদাই বেঁচে আছি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যুদ্ধ নিয়ে।

শুন্ডির রাজা ঃ (নত মস্তক উন্নত করে) যুদ্ধ? তা কেমন করে?

পাগলা দাশু ঃ সে অনেক কথা। কিন্তু গুপীদা আর বাঘাদা কোথায়? ওদের আমার খুব লাগবে।

[বাম উইংস দিয়ে গুপী গায়েন ও বাঘা বায়েনের প্রবেশ]

বাঘা বায়েন ঃ এই যে নাম না করতে করতেই চলে এসেছি, বলো কি করতে হবে? ভাইটি।

পাগলা দাশু ঃ কিছু না। তোমার ঐ গান শুনিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। আসলে বোম্বাগড়ের রাজা হিরক রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে বলে উঠে পড়ে লেগেছে।

বাঘা বায়েন ঃ এ তো ভয়ানক! কি বলো গুপী?

গুপী গায়েন ঃ সত্যিই তো ভয়ঙ্কর অতি।
শোনো আমরা বরং গান গেয়ে,
যাচ্ছি বোম্বাগড়ের রাজাকে শান্ত করতে।
তুমি সত্ত্বর প্রদোষচন্দ্র মিত্র বাবুকে নিয়ে,
দাও হানা হিরক রাজার ওখানে।

[স্পট লাইটের আলো অফ হলো]

দৃশ্য — ৩

[স্পট লাইট অন হলো]

[স্পট লাইটের নীচে প্রদোষচন্দ্র মিত্র তথা সকলের প্রিয় গোয়েন্দা ফেলুদা আর তাঁর ভাইপো তথা তপেসরঞ্জন মিত্র ওরফে তোপসে বসে]

[একটি বেলের শব্দ। বাম উইংস দিয়ে তোপসে গেল]

[খটাং করে দরজা খোলার শব্দ ব্যাকগ্রাউণ্ডে]

ফেলুদা ঃ (খানিক চিন্তান্বিত মুখে) কে রে তোপসে? জটায়ু নাকি?

[বাম উইংস থেকে তোপসে আর জটায়ুর প্রবেশ]

জটায়ু ঃ আপনার টেলিপ্যাথির যে বহুত জোর, তা এলেম করতে হয় মশাই। কিন্তু, বিশেষ খবর আছে। পেয়েছেন কী?

তোপসে ঃ আপনার লেখা নতুন গল্পের কথা বলছেন?

জটায়ু ঃ আরে না না।

তোপসে ঃ তাহলে কি—

ফেলুদা ঃ বোধ হয় আজকে আমার কাছে দাশুর আসার কথা, I mean appointment নিয়ে বলছেন তো?

জটায়ু ঃ (একটু অবাক হয়ে) আরে মশাই আপনার তো কোনো জবাবই চলে না, তা কি বলবেন ঠিক করলেন?

ফেলুদা ঃ দেখা যাক। আগে তো আসতে দিন।

[আবারও ব্যাকগ্রাউন্ডে বেলের শব্দ। তোপসে উঠে যায়।]

[বাম উইংস দিয়ে তোপসে এবং পাগলা দাশুর প্রবেশ)

পাগলা দাশু ঃ নমস্কার স্যার।

ফেলুদা ঃ নমস্কার। আমি প্রদোষচন্দ্র মিত্র। এ তপেসরঞ্জন মিত্র ওরফে তোপসে। আমার খুড়তুতো ভাই। আর ইনি আমার বন্ধু বিশিষ্ট রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনির সাহিত্যিক জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলী।

[তিনজন নমস্কার করলেন]

জটায়ু ঃ তা আপনি আমার লেখা পড়েছেন?

পাগলা দাশু ঃ মানিকবাবুর সিনেমার দৌলতে আপনি লেখক জেনেছি।

তোপসে ঃ তাহলে লালমোহনবাবু আপনার কদর কমলো বলুন।

পাগলা দাশু ঃ না। কদর কমার কিছুই হয়নি। কিন্তু সেটাই তো আজকের আলোচনার একমাত্র বিষয়বস্তু হতে পারে না। কেননা আমি একটা ঘোরতর সমস্যা নিয়ে আপনাদের এখানে এসেছি।

ফেলুদা ঃ আপনি আসার আগে থেকেই সেরকম আভাস পাচ্ছিলাম। আজকের মাসিক সন্দেশ পত্রিকাতেও আপনাদের ঘটনাটা বেশ রসিয়ে সাহিত্যিক আকারে লিখেছে দেখলাম হিরক রাজার সভাকবি। লেখাটা আপাতসুন্দর, তার কারণ লেখাটিতে বেশ কাব্য আছে। কিন্তু বিষয়বস্তুর মানে বুঝলে অত্যন্ত রাগ হওয়া যে অসম্ভব নয় তা বলাই বাহুল্যমাত্র।

পাগলা দাশু ঃ তাও যদি কিছু অন্তত করা যায় তাহলে একটু দেখুন। তারপরে তো আমি আছি।

ফেলুদা ঃ সে তো অবশ্যই। আপনি যে পাগলামি করে বহু দুরূহ ঘটনায় নিজেকে বাঁচিয়েছেন তা আমারও খুব ভালো লাগে। অবশ্যই আপনারও সাহায্য লাগবে বৈকি।

জটায়ু ঃ আচ্ছা। আমাদের একবার উদয়ন পণ্ডিতের কাছে গেলে হয় না?

ফেলুদা ঃ এতক্ষণে একটা কাজের কথা বলেছেন। দাশু আপনিও যাবেন নাকি?

পাগলা দাশু ঃ বেশ গেলেই হয়।

ফেলুদা ঃ বেশ চলুন তাহলে।
(জটায়ুর দিকে তাকিয়ে) লালমোহন বাবু চলুন।
(তোপসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে) এই তোপসে ডাইরিটা কিন্তু সঙ্গে নিস।

তোপসে ঃ বেশ।
[ওরা বাম উইংস দিয়ে বেরিয়ে গেলো। স্পট লাইট অফ হলো।]

[আবার স্পট লাইট অন হলো।]

[বাম উইংস দিয়ে ফেলুদা, তোপসে, জটায়ু ঢুকে স্পট লাইটের দিকে আসছেন।]

জটায়ু ঃ একটা প্রশ্ন ছিল। করতে পারি?

ফেলুদা ঃ করতে পারেন অসংকোচে।

জটায়ু ঃ আদৌ কি এর সমাধান আছে?

পাগলা দাশু ঃ মানে ঠিক কী বলতে চাইছেন?

ফেলুদা ঃ (পাগলা দাশুকে ইঙ্গিতে চুপ করতে বলে) সমাধান অবশ্যই আছে তবে একটু ভাবতে হবে।

[ডান উইংস দিয়ে বেরিয়ে গেলেন সবাই]

[লাইট অফ হলো]

[লাইট অন হতেই দেখা গেল উদয়ন পণ্ডিতের মাটির বাড়ি।]

[বাম উইংস দিয়ে ফেলুদার প্রবেশ।]

[উদয়ন পন্ডিত বই বগলদাবা করে বেরোচ্ছিলেন। ফেলুদাদের দেখে উচ্ছ্বসিত]

উদয়ন পণ্ডিত ঃ আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।

জটায়ু ঃ (লাফিয়ে উঠে) ও তাই নাকি।

উদয়ন পণ্ডিত ঃ (স্তম্ভিত হয়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

(ফেলুদাকে উদ্দেশ্য করে) আমাদের একবার হিরক রাজ্যে যাওয়া উচিত। চলুন যাই।

ফেলুদা ঃ আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবছিলাম। চলুন যাই।

জটায়ু ঃ এক্ষুনিই! মানে এত রাস্তা হেঁটে এলাম। বসতে দেবেন না?

তোপসে ঃ (জটায়ুকে উদ্দেশ্য করে) এরপর কিন্তু বসার জন্য মখমলের আসন পাবেন।

জটায়ু ঃ বলছো? বেশ চলো। (তোপসের দিকে তাকিয়ে)

[ডান উইংস দিয়ে সবাই বেরিয়ে গেল]

[লাইট অফ হলো]

দৃশ্য — ৪

[লাইট অন হলো]

[ঠিক স্পটলাইটের নীচে বসে আছেন সিংহাসনে হিরক রাজা। তাঁর পাশে বিদূষক। তাঁদের ঘিরে সভাসদবৃন্দ।]

[বাম উইংস দিয়ে ফেলুদা, তোপসে, জটায়ু, পাগলা দাশু এবং উদয়ন পন্ডিতের প্রবেশ।]

[বাম উইংস দিয়ে কিছুটা এসে।]

ফেলুদা ঃ আসতে পারি?

[হিরক রাজা সচকিত হয়ে]

হিরক রাজা ঃ আসুন, আসুন।
বসুন, বসুন।
আপনাদের জন্যই তো অপেক্ষা,—
হয়েছে এখানে বেশ দুর্যোগের ঘনঘটা।

জটায়ু ঃ (লাফিয়ে, হালকা দৌড়ে রাজাকে সেলাম করে) সেই জন্যই তো আমাদের এখানে আসা।

ফেলুদা ঃ (হিরক রাজাকে উদ্দেশ্য করে) নমস্কার। আমি ফেলু মিত্তির ওরফে প্রদোষচন্দ্র মিত্র। এ আমার খুড়তুতো ভাই তোপসে। তপেসরঞ্জন মিত্র।
(জটায়ুকে দেখিয়ে) আর ইনি আমার বিশিষ্ট সাহিত্যিক বন্ধু লালমোহন গাঙ্গুলী; ওরফে জটায়ু।

হিরক রাজা ঃ বেশ খুশি হলাম সাক্ষাতে,
কথা চলুক বাহুল্যের সাথে।

পাগলা দাশু ঃ আপনি তো খুশি হলেন বুঝলাম। কিন্তু আমরা তো খুশি হতে পারলাম না।
কি আর করা যাবে?

ফেলুদা ঃ (পাগলা দাশুর দিকে তাকিয়ে তারপর হিরক রাজার দিকে তাকালেন) হ্যাঁ। ঠিক কথা। আপনারা নাকি যুদ্ধ করছেন? সেটা কি আপনার ব্যক্তিগত বা একান্ত সিদ্ধান্ত?

হিরক রাজা ঃ মোটেই না, মোটেই না।

যুদ্ধের ভূত আর ছাড়লো না!
বোম্বাগড়ের রাজার হচ্ছে খুব মজা,
হঠাৎ করে যুদ্ধে মরে আসলে প্রজা।

উদয়ন পণ্ডিত ঃ এতদিন পরে আপনি একটা ঠিকঠাক কথা বললেন। আসলে তো দোষটা আমাদেরই। ব্যাপারটা বুঝলেন?
ব্যাপারটা ঠিক এইরকম যে,
যাদের হাতে অস্ত্রের মূল্য নেই সে,—
ক্ষমতার জোরে যুদ্ধে মেতেছে।

ফেলুদা ঃ হ্যাঁ এটার সাথে আমিও সহমত। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে কোথাও যেন অল্পমধুর রাষ্ট্র ক্ষমতার ঔদ্ধত্য সাড়া দেয়। (সবাইকে একবার পরখ করে) তা যুদ্ধ বন্ধ করার উপায় কি?

হিরক রাজা ঃ উপায় তো একটাই বিজ্ঞানীর আবিষ্কার,
কিছুদিন পর তিনি যাবেন শঙ্কুর কাছে পরিষ্কার।

জটায়ু ঃ আচ্ছা। বোম্বাগড়ের রাজাকে শান্তির বার্তা দিতে কেউ যাচ্ছে কি?

পাগলা দাশু ঃ যাচ্ছেই তো। গুপী-বাঘা।

জটায়ু ঃ উফফ্। দুর্ধর্ষ।

[লাইট অফ হবে]

দৃশ্য — ৫

[লাইট অন]

[মঞ্চ ফাঁকা। বাম উইংস দিয়ে ঢুকছে গুপী-বাঘা। ধীরে ধীরে স্পটলাইটের দিকে আসছে গান গেয়ে]

গুপী ঃ বলি শোন রে শোন,
মোরা হয়নি এখনো গোপন।
এখনও মোদের জারিজুরি চলে?
এখনও আমরা চলি ভূতের বরে।

আসছি, মোরা এসেছি,
চলছি পুরোনো পথে
স্বপ্নে ভেসে থাকছি,
যুদ্ধ থামার প্রাতে।

মোদের যত আছে জারিজুরি,
সব দিয়ে ধরব চড়ি

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা আর
থাকবে না সাক্ষাতে।

ওরে তোরা শোন সবে
মোদের এ প্রয়াস ব্যর্থ না হবে।

বলি শোন রে শোন
মোরা হইনি এখনও গোপন।
এখনও মোদের জারিজুরি চলে,
এখনও আমরা বলি ভূতো রাজার বরে।

[বাঘার ঢাকের বোল বেজে চলছে।]

বাঘা ঃ (ছন্দকাব্যে) দিলে ষাট,
বাধাখান
বলাই ষাট
ভাঙবে মান।

(গান)

গুপী ঃ ওরে এবার তোরা শুধরো,
যুদ্ধ থেকে মুখ তুলে দ্যাখগো।
দ্যাখ কত লোকে ভুখা মরে

দ্যাখ কত লোকে ভুখা মরে
কতজনে তাদের মারে
তারি মাঝে যুদ্ধ করে

ওরে তারি মাঝে যুদ্ধ করে
সত্যি তোদের ভিত যে নড়ে
বলি শোন রে শোন
মোরা হইনি এখনো গোপন।

[গুপী-বাঘা ডান উইংস দিয়ে বেরিয়ে যায়]

[লাইট অফ হয়]

[লাইট অন হলো। যুদ্ধে এগোচ্ছে বোম্বাগড়ের রাজার এবং হিরক রাজার সেনারা।]

[হঠাৎ যুদ্ধ শুরু হয় স্পটলাইটের নীচে]

(গান)

গুপী ঃ ওরে থাম

ওরে থাম
থাম থাম থাম
তোরা থাম
যুদ্ধের থেকে নাম
তোরা থাম।
তোরা দেখিসনি কি মানুষ মরে?
তোরা দেখিসনি কি মানুষ মরে?
রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে
তোরা যুদ্ধ করে নিজেরে মারিস।
যুদ্ধ থেকে সরতেই পারিস।
ওরে দ্যাখরে চেয়ে রক্তগঙ্গা,

ওরে দ্যাখ রে চেয়ে রক্তগঙ্গা
এবার তোরা নিজেরে সামলা
ওরে থাম
থাম থাম থাম
ওরে থাম।

[বাঘার বাদ্যের বলে আর গুপীর গানে যুদ্ধ সমাপ্ত হলো।]

[লাইট অফ হলো।]

দৃশ্য — ৬

[লাইট অন]

[স্পটলাইটের নীচে হিরক রাজা, বোম্বাগড়ের রাজা, বিদূষক। হিরক রাজসভায় সবাই বসে আছেন। বাম উইংস দিয়ে ঢুকছেন পাগলা দাশু, গুপী, বাঘা, ফেলুদা, তোপসে, জটায়ু, উদয়ন পণ্ডিত। চলছে শঙ্কুর কাছে যাওয়ার তোড়জোড়। শোনা যাচ্ছে নাকি প্রোফেসর শঙ্কু আর হিরক রাজ্যের বিজ্ঞানী যুদ্ধবিরোধী শান্তিবোমা তৈরি করছেন পৃথিবীতে শান্তি আনতে।]

ফেলুদা ঃ আর বসে রইলেন কেন? চলুন।
(তোপসের দিকে তাকিয়ে)
ডাইরিটা তোর হাতে তো?

তোপসে ঃ তা আর বলতে!

জটায়ু ঃ এবার চলুন। ওরা কি করছে দেখতে হবে তো নাকি!

পাগলা দাশু ঃ এবার এগোনো যাক।

[মঞ্চস্থ সবাই বাম উইংস দিয়ে বেরিয়ে গেল।]

[স্পটলাইট অন হলো]

[স্পটলাইটের ঠিক নীচে মঞ্চ থেকে উপরে বোমা তৈরি হয়েছে ফুলের]

[নীচে বিজ্ঞানী আর শঙ্কু উপরে ঘাড় উঁচিয়ে দেখছে]

[বাম উইংস দিয়ে সকলের প্রবেশ]

ফেলুদা ঃ (উপরের দিকে তাকিয়ে) বানিয়ে ফেলেছেন? যাক বাঁচা গেল।

বিজ্ঞানী ঃ না না এর সাথে আছে মগজাস্ত্র,
যাতে তাড়ানো যায় ক্ষমতার অস্ত্র।

জটায়ু ঃ বাঃ। দারুণ! কি বলেন?

উদয়ন পণ্ডিত ঃ আসলে ক্ষমতার অন্ধত্ব কেটে গেলে,
যুদ্ধের ঔদ্ধত্যও একা যাবে চলে।

পাগলা দাশু ঃ যাক বাঁচা গেলো।

গুপী ঃ মোরা গুপী-বাঘা দুজনাই ভাইরাভাই।

বাঘা ঃ ভাইরাভাই।

গুপী ঃ মোরা ভূতের রাজার বরের জোরে

বাঘা ঃ ভূতের রাজার বরের জোরে

গুপী ঃ যুদ্ধের ভূত ছাড়াই। (মোরা দুজনাই ভাইরাভাই)

[স্পটলাইট আস্তে আস্তে গুপী-বাঘা কেন্দ্রিক হয়ে মৃদু হয়ে আসবে।]

[যবনিকা পতন]

মুক্তিযোদ্ধা

অনন্ত দাস (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

সালটা ১৯৭১। বাংলাদেশের ঢাকাতে অগ্নিময় উত্তাল অবস্থা। জায়গায় জায়গায় পাকিস্তানি সৈনিকদের ছোঁড়া গুলিতে প্রচুর বাংলাদেশী বিপ্লবীরা প্রাণ দিতে থাকে। জায়গায় জায়গায় ডিনামাইট ফেলার জন্য প্রচুর আন্দোলনকারী যুবকরা স্পটেই মারা যায়; তাদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। ঘর থেকে টেনে বার করে সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। এরকমই এক সন্ধ্যাবেলায় রণদীপ বাড়িতে এসেছে। রণদীপের মা, বাবা আর এক বোন। বাবা বলে — রণ এইরকম পরিস্থিতি আমরা প্রতি মুহূর্তে আতঙ্কে আছি। রণর মা রান্নাঘর থেকে রণর গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে দ্রুত এসে বলে — রণ বাবা বাড়ি এসেছিস। আমরা সবাই যে বড় আশঙ্কার মধ্যে আছি। তুই আমাদের একমাত্র ভরসা বাবা, সবসময় সাবধানে থাকিস বাবা। রণ মাকে জড়িয়ে ধরে আশ্বস্ত করে বলে, মা তুমি ভয় পেও না আমার কিচ্ছু হবে না, তোমার আর বাবার আশীর্বাদ আছে আমার মাথার উপর। বোন উর্মী পড়ার ঘর থেকে দৌড়ে এসে বলে — দাদা বাড়ি এসেছিস; আমি খুব খুশি হয়েছি। চল দাদা ঘরে চল বলে উর্মী রণদীপকে তার পড়ার ঘরে নিয়ে যায়। উর্মি দাদাকে বলে — জানিস দাদা আমার ভীষণ ভয় করছে দাদা এখানে এভাবে থাকতে। স্কুলেতো আর যেতে পারছি না। আমার বান্ধবীকে তুলে নিয়ে গেছিল শয়তানেরা, তাকে আর বাঁচতে দিল না। চল দাদা আমরা পালিয়ে ভারতে চলে যাই। রণদীপ বলে — হ্যাঁ, চল ভারতে। আমরা সবাই ভারতেই যাই। তবে আমরা আমাদের বাংলাদেশকে স্বাধীন করবোই। উর্মী বলে সেটা কি সম্ভব দাদা? রণদীপ বলে — সম্ভব বোন, সমস্ত বাংলাদেশের সবাই জেগে উঠেছে। এই স্বাধীনতার যজ্ঞে অনেক প্রাণ আহুতি যাচ্ছে, ঠিক সফল হবেই, আত্মবলিদান ব্যর্থ হবে না। এদিকে তখন স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তিনি উদারতার সঙ্গো গরীব মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। এ সংবাদ বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে গিয়ে পৌঁছেছিল। উর্মী দাদাকে বলে — চল না দাদা, আমরা ভারতে চলে যাই, নাহলে আমাদের বাঁচতে দেবে না। রণদীপ বলে — ঠিক আছে বোন, আমি মুজিবর রহমান জ্যেঠুকে বলি ওনারাও যাতে এখান থেকে যান আমাদের সঙ্গো। উর্মী বলে — ঠিক আছে দাদা, তুই যা ওদের গিয়ে বল। রণদীপ একমুহূর্ত দেরী না করে বার হয়ে পড়ে। এদিক ওদিক দেখে গলি শেষে কার্তিক মাসের ধানখেতের মধ্যে দিয়ে অনেক কষ্টে শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ি এসে খিড়কি দরজার কাছে এসে টোকা দিতে থাকে শেখ মুজিবর রহমানের স্ত্রী এসে বলে, কে কে? রণদীপ আস্তে বলে — আমি রণদীপ জ্যেঠিমা কথা আছে, তাড়াতাড়ি দরজা খুলুন। রহমানের স্ত্রী দরজা খুলে রণকে ভেতরে ডাকে আয় আয় ভেতরে আয়। শেখ মুজিবুর রহমান তখন সপরিবারে খেতে বসেছেন। মুজিবর রহমান বলেন — কি হয়েছে বাবা? রণদীপ বলে — জ্যেঠু আপনাদের এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়, আপনারা চলুন ভারতে আমরাও যাব। মুজিবর রহমান যেন জানতেন ওনাদেরও যেতে হবে তাই আগে থেকেই সমস্ত গুছিয়ে রেখেছিলেন। মুজিবর রহমান বলেন, তুমিও একটু খেয়ে নাও বাবা আমাদের সঙ্গো। রণদীপ বলে — আচ্ছা হ্যাঁ। সবাই একসঙ্গো খেয়ে নেয়। এদিকে রণর বোন বাবা, মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে খাইয়ে দেয় নিজেও খেয়ে নেয়। তারপর সব গুছিয়ে রাখে। এদিকে সবাই বার হয়ে পড়ে জিনিসপত্র নিয়ে। সবার বাড়ি ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু কিছু করার নেই। সবাই ধান বাগানের

মধ্য দিয়ে ওদের বাড়িতে এসে ওঠে। রণদীপ সবাইকে নিয়ে ঘরে ঢোকে আর বাবা, মা ও বোনকে বলে — চল বোন আমারা ভারতে যাব তাড়াতাড়ি কর। মনে জোর রাখ, ভগবান আর আল্লা যদি সহায় হয় আমরা ঠিক যেতে পারবো। ওরা আস্তে আস্তে নদীর দিকে এগোলো, নদীতে শুধু হাঁটু সমান জল, ওরা সবাই ভাগ্যের জোরে নদী পার হয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগল।

ওরা বনগাঁ শহরের মধ্যে এসে পৌঁছাল। একটা রাস্তার মোড়ে টিউকল থেকে হাত-পা ধুয়ে একটা পথ বিশ্রাম ঘরে বসল, তখন সকাল হয়ে গেছে। ওরা রাস্তার লোককে জিজ্ঞাসা করল — কলকাতা যাওয়ার ট্রেন কোথায় পাওয়া যায়। বনগাঁ স্টেশনে যেতে হবে লোকটি বলল। ভ্যান পাওয়া যাবে, ওরা লোকটির কাছে জিজ্ঞাসা করল — হ্যাঁ পাওয়া যাবে একটু অপেক্ষা করুন। কিছুক্ষণ পরে ওরা ভ্যান নিয়ে স্টেশনে এসে কোলকাতার ট্রেনে উঠল। মুজিবর রহমান ওনার পরিচিত একজনকে টেলিফোন করলেন থাকবার জন্য কোন ঘর হবে কিনা জানবার জন্য। তিনি জানালেন — হবে ঘর, যতদিন পারবেন থাকবেন। বিশিষ্ট মানুষ বলে কথা। ভারতীয় পরিচিতের বাড়িতে পৌঁছে সব বিষয় খুলে বলেন এবং সাহায্য চান ওনাদের দেশকে স্বাধীন করবার জন্য। ভারতীয় পরিচিত মানুষটির সাহায্যে যখন ইন্দিরা গান্ধীর শরণাপন্ন হন, তখন ইন্দিরা গান্ধী সর্বতোভাবে সাহায্য করেন তাদেরকে। যুদ্ধ জাহাজ ও সৈনিক দিয়ে সাহায্য করেন। সুদীপ রায় পুলিশ বাহিনীর প্রধান। রণদীপ যোগ দেয় তাদের সঙ্গে। যুদ্ধ বিমানে করে গিয়ে ভারতীয়রা বাংলাদেশের হাইওয়ে, রানওয়ের সর্বত্র প্রতি ইঞ্চিতে বোমা ফেলতে শুরু করে এবং বাংলাদেশের আওয়ামীলীগ মুক্তিফৌজের সঙ্গে যোগ দেয় তাদেরকে ট্রেনিং দেয়। তারা গিয়ে পাকিস্তানের সৈনিকদের যুদ্ধ জাহাজে জল মাইন ফিট করে দেয়, ফলে সে জাহাজগুলো সব ভারত মহাসাগরে, বঙ্গোপসাগরে ডুবে যায়। পাকিস্তানি সৈনিকরা সাঁতার না জানায় তারা বন্দী হয়ে যায় আওয়ামীলীগ ফৌজের হাতে। এরপর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। বাংলাদেশের সবাই আবার দেশে ফিরে যায়।

ক্ষণিক জীবন

শোয়েব মণ্ডল (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

উলুখাগড়ার প্রান্ত হতে ঝরে পড়েছি
অস্থায়ী অবনীর মাঝে,
আঁকাবাঁকা নরম নদীতে কাটছি
সাঁতার হস্ত পদ নেড়ে।

কোথাও দেখি সাদা সফেন
কোথাও দেখি টুকরো টুকরো পাথর,
আঁকড়ে ধরি তারে বক্ষ মাঝে
জীবনেরে করিতে কঠোর।

হঠাৎ একদিন বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে
রব না কারো ছোটগল্প ও ডায়েরিতে।

তারকেশ্বর

সৌম্যজিৎ মণ্ডল (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

তারকেশ্বর, পশ্চিমবাংলার হুগলী জেলার চন্দননগর মহকুমার অন্তর্গত এক সুন্দর শহর। তারকেশ্বর এই নামটির সঙ্গে কম বেশি সবাই পরিচিত। এই প্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থক্ষেত্রের খ্যাতি সারাদেশে সমাদৃত। পশ্চিমবাংলা রাজ্যের সর্ববৃহৎ জনপ্রিয় শিবমন্দির এই শহরে অবস্থিত। তারকেশ্বর শহরটিতে আসতে গেলে হাওড়া-তারশ্বের লোকাল ট্রেন চেপে মাত্র ৫৭ কিমি. দূরত্বে এসে তারকেশ্বর স্টেশনে নেমে মাত্র ৫ মিনিট হেঁটে বা টোটোর ব্যবস্থাও আছে যা নিয়ে যাবে তারকেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে। বর্তমানে তারকেশ্বর থেকে গোঘাট ট্রেন চলাচল হয় এবং পরবর্তীকালে গোঘাটের পর থেকে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভিটা কামারপুকুর হয়ে মা সারদা ভিটা জয়রামবাটি হয়ে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর পর্যটন কেন্দ্রের সঙ্গে ট্রেন চলাচল যোগাযোগ ব্যবস্থার কাজ দ্রুত হারে চলছে খুব তাড়াতাড়ি শেষ হবে। যা পরবর্তী পর্যায়ে পর্যটন শিল্পে গভীর মাত্রা এনে দেবে। এছাড়া আরও যোগাযোগের জন্য রয়েছে তারকেশ্বর বাসস্ট্যান্ড, যেখান থেকে প্রতিদিন বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, নদীয়া এই সমস্ত জেলার বাস চলাচল হয়ে থাকে। নিত্যদিন বহু পর্যটক বাবা তারকেশ্বরের দর্শন পাওয়ার আশায় ছুটে আসে। এছাড়াও অনেকে আসে ব্যাবসা-বাণিজ্য করতে রুটি-রুজির আশায়। এই প্রকৃতিময় তারকেশ্বর মন্দিরের ইতিহাস এবং দুটি যে বিখ্যাত মেলা সেই নিয়েই আমার আলোচনা।

মন্দিরের ইতিহাস ঃ—

ইতিহাস খুঁজলে জানা যায়, তারকেশ্বরের পূর্বে নাম ছিল তাড়পুর, সেখান থেকে বাবা তারকনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠার পর এই স্থানটির নাম হল তারকেশ্বর। তারকনাথের মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা হলেন উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা বিষ্ণু দাস নামের এক শিবভক্ত। উত্তরপ্রদেশ থেকে এসে তিনি তারকেশ্বরের খুব কাছে রামনগরে বসবাস করতেন। বিষ্ণুদাসের ভাই ছিল ভারমল্ল; যিনি প্রত্যহ গভীর জঙ্গলে গরু চরাতে যেতেন। এবার হল ইতিহাসের শুরু — প্রত্যহ গরু চরাতে গিয়ে ভারমল্ল দেখতেন, প্রত্যহ গরু চোখের নিমেষে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে এক কালো পাথরের ওপর প্রতিদিন দুধ দিত, এই অদ্ভুত দৃশ্য একদিন ভারমল্ল দেখে ফেলেন। দেখার পর ভাই ভারমল্ল দাদা বিষ্ণুদাসকে ব্যাপারটা জানায়। তারপর বিষ্ণুদাস ব্যাপারটি সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ পাওয়ার আশায় ভাইয়ের সাথে জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সেই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন। তিনি সেই ব্যাপারটি দেখে অবাক হন। তারপর সেই রাতে বিষ্ণুদাস স্বপ্ন পান সেই কালো পাথর আসলে আর কেউ না, স্বয়ং মহাদেব। তারপর বিষ্ণুদাস সেই শিবলিঙ্গটিকে তার রামনগরে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য খোঁড়া-খুড়ি শুরু করেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ। মাটি যত খোঁড়ে, তত মাটির নীচের দিকে শিবলিঙ্গটি চলে যেতে থাকে। এরপর সেই রাতে বিষ্ণুদাস আবারও স্বপ্ন পান যে, তিনি অর্থাৎ মহাদেব সেখানেই থাকবেন, তিনি লোকমানবে পূজিত হবেন তারকনাথ রূপে এবং বিষ্ণুদাসই হবেন তাঁর অর্থাৎ মহাদেবের পূজারী। এই তারকনাথের নাম অনুসারে পূর্বের নাম তাড়পুর থেকে বর্তমান নাম হয় তারকেশ্বর।

এই মন্দিরের ঠিক উত্তরদিকে রয়েছে — দুধপুকুর। সে জলে স্নান করলে রোগ, শোক, পাপ, দুঃখ দূর হয়। মন্দিরের উল্টো দিকেই রয়েছে নাটমন্দির এবং রয়েছে নারায়ণ মন্দির, রয়েছে মা কালীর মন্দির এবং মা মনসার মন্দির। আছে মন্দিরের খানিক বাইরে রাজবাড়ি, যেটিতে বর্তমানে বাবা তারকনাথের পূজারী মহন্ত মহারাজ বসবাস করেন।

এই তারকেশ্বরে প্রচলিত দুই মেলা খুবই বিখ্যাত, সেগুলি বাংলা সালের শ্রাবণ মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং আরও একটি হল চৈত্র মাসে চৈত্রমেলা যা গাজনমেলা রূপে পরিচিত। তথাকথিত শ্রাবণ মাসের মেলাটি হল শ্রাবণীমেলা, যেটি ইংরাজির জুলাই-আগস্ট মাসে হয়ে থাকে এবং চৈত্রমেলাটি মার্চ-এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

শ্রাবণী মেলা ঃ—

শ্রাবণী মেলা মূলত শ্রাবণ মাসের গুরু পূর্ণিমা থেকে শুরু করে রাখী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাবা তারকনাথের জন্মমাস হল শ্রাবণ মাস; তাই সারা মাস ধরে অগণিত ভক্তবৃন্দ ছুটে আসে বাবার টানে এবং মুখে বলতে থাকে — "ভোলে বাবা পার করেগা।
বম্ বম্ তারক বম্।"

ভক্তরা শেওড়াফুলির নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে জল ভরে কাঁধে বাঁক নিয়ে ছুটতে থাকে। এই শ্রাবণী মেলা সারা মাস ধরে হলেও মূলতঃ খুব ভিড় হয় রবিবার এবং সোমবার। পশ্চিমবাংলার বহু প্রান্ত থেকে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, বর্ধমান, দুই ২৪-পরগনা, কলকাতা, হাওড়া প্রায় সমস্ত জেলা থেকে তো বটেই তার সাথে পশ্চিমবাংলার বাইরের রাজ্য বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকেও অগণিত ভক্তবৃন্দ প্রতিনিয়ত এসে উপস্থিত হয়; তারকনাথের মাথায় জল, দুধ, ঢালার আশায়।

চৈত্রমেলা ঃ—

চৈত্রমেলা মূলতঃ চৈত্রমাসের সারামাস জুড়েই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিশেষভাবে নীল, চড়ক, ঝাঁপ এই দিনগুলিতে বেশ ভিড় চোখে পড়ার মতো হয়। এই মাসে বাবার ভক্তবৃন্দ গলায় উত্তরীয় ধারণ করে সন্ন্যাস নেন এবং প্রতিদিন হবিষ্যি খান এবং ঝাঁপের দিন কাঁটায় ঝাঁপ দেখার মতো হয়। এই মাসে বাবা তারকনাথের সঙ্গে মা পার্বতীর বিয়ের মাসও বলা হয়। নীলের জাতির দিন এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, বাবা তারকনাথকে রাজবেশ পরিয়ে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই মেলায় বেশির ভাগ দুই ২৪-পরগনা, দুই মেদিনীপুর এই সমস্ত জেলার মানুষজন আসে এবং ভক্তবৃন্দ মুখে বলে— "বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে মহাদেব।"

এই দুই মেলা ছাড়াও শিবরাত্রিতে এবং জানুয়ারী মাসের ছুটির সময় শীতকালে এবং প্রতিদিনই বহু পর্যটক ভক্তবৃন্দ বাবার টানে এসে হাজির হয়। কথিত আছে, মা সারদাও এই মন্দিরে স্বয়ং পূজা দিতে আসতেন। এই মন্দিরটি UNESCO কর্তৃক হেরিটেজ হিসেবেও চিহ্নিত হয়েছে।

অগণিত ভক্ত বাবার কাছে ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়ায় পাগলের মতো বাবার একবিন্দু দর্শন পাওয়ার আশায় বার বার ছুটে আসে। আসে তারা বিভিন্ন আশায়। সন্তানের মঙ্গল কামনায়, সংসারের মঙ্গল কামনায়।

বাহা উৎসব : এক সুন্দর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

সুরেশ মণ্ডল (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

বাহা সাঁওতালি শব্দ, বাংলায় তার আক্ষরিক অর্থ হল — ফুল। ফুলে থাকে বহু রঙিন পদার্থ, পরব অর্থাৎ উৎসব। অতএব 'বাহা-পরব' বাংলা অর্থে ফুল নিয়ে পুজো ও উৎসব। বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এবং ভারতের পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, এছাড়াও কোচবিহারের কিছুটা অংশে এই উপজাতির মানুষগুলি তাদের সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে এমন বহু উৎসব রয়েছে। এর মধ্যে 'বাহা' একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহ্যবাহী উৎসব। এই উৎসব প্রধানত আদিবাসী জনজাতি, বিশেষ করে 'সাঁওতালদের' মধ্যে পালিত হয় এবং তাদের সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাহা উৎসবের মূল আকর্ষণ হলো — এটি একটি প্রাকৃতিক উৎসব, যা প্রাকৃতিক জীবনের সাথে মানুষের সম্পর্কের সৌন্দর্যের গভীরতাকে তুলে ধরে।

বাহা উৎসবের উৎস ঃ—

বাহা শব্দটি আদিবাসীদের ভাষা থেকে এসেছে, যার অর্থ ফসলের উৎসব। এটি মূলত কৃষকরা তাদের ফসলের ভাল ফলন এবং প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে পালন করে থাকে। এই উৎসব সাধারণত আঞ্চলিক ভিন্নতায় পালিত হয়। তবে এর মৌলিক উদ্দেশ্য একই থাকে — প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক মজবুত করা এবং সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করা।

পাহাড়ী অঞ্চল, বিশেষ করে বিভিন্ন আদিবাসী জনগণের মধ্যে বাহা উৎসব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রত্যেক উপজাতি তাদের নিজস্ব রীতি-নীতি অনুযায়ী এই উৎসব পালন করে, তবে সাধারণভাবে এটি কৃষির সঙ্গো সম্পর্কিত এবং প্রকৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি অনুষ্ঠান।

বাহা উৎসবের সময় ঃ—

বাহা উৎসব সাধারণত অক্টোবর-নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। যখন বোরো ধান এবং অন্যান্য শস্যের ফলন ঘরে তোলা শুরু হয়। এই সময় কৃষকরা তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ পাওয়া শস্যের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে। সৌন্দর্য এবং ফসলের সফল বা ভালো ফলনকে সম্মান জানাতে অনুষ্ঠিত হয়।

বাহা উৎসবের প্রথা ও রীতিনীতি ঃ—

বাহা উৎসবের শুরু হয় একটি বিশেষ পূজা দিয়ে। এতে মূলত কৃষি দেবতা বা প্রকৃতির প্রতীকগুলিকে সম্মান জানানো হয়। পূজার মধ্যে ফসল, ফল, ফুল এবং বিশেষ করে মহুয়া ফুল এবং অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্য দিয়ে আলাদা করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। একে অপরের সঙ্গো দান-প্রতিদান এবং খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে মিলনমেলা হয়।

এই সময় আদিবাসীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করে এবং বিভিন্ন ধরনের নাচ-গান, খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। গান ও নাচের মাধ্যমে তারা প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানায় এবং তাদের সমাজের ঐক্যবদ্ধতা ও সৌহার্দ্য প্রকাশ করে।

বাহা উৎসবের সামাজিক গুরুত্ব ঃ—

বাহা উৎসব শুধু একটি ধর্মীয় বা কৃষি উৎসব নয়। এটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানও বটে। এই উৎসবের মাধ্যমে আদিবাসী সমাজে সাম্প্রদায়িক ঐক্য বৃদ্ধি পায়। প্রথাগতভাবে, বাহা উৎসবে সবাই একত্রিত হয়ে আনন্দ ভাগাভাগি করে এবং এটি সমাজে ভালোবাসা, সহযোগিতা এবং একে অপরের প্রতি সহানুভূতির ভিত্তি স্থাপন করে।

এছাড়াও বাহা উৎসবের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে তাদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করানো হয়। প্রাচীন গান, নাচ এবং ঐতিহ্যবাহী পোশাকের মাধ্যমে তারা তাদের পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতিকে জীবন্ত রাখে এবং তাদের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক শেকড়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

বাহা উৎসব এবং পরিবেশ সচেতনতা ঃ—

বাহা উৎসবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো — পরিবেশ সচেতনতা। এই উৎসবের মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। আদিবাসী জনগণ ঐতিহ্যগত ভাবে প্রকৃতির সঙ্গেই বাস করে এবং তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিবেশের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বাহা উৎসব তাদের এই সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করে এবং তাদের জীবনে প্রকৃতির গুরুত্বকে তুলে ধরে।

এছাড়া এই উৎসবের মাধ্যমে কৃষির প্রতি আগ্রহ এবং উদ্ভাবনী নতুন চিন্তা জন্ম নেয়, যা পরবর্তীতে কৃষি সম্পর্কিত অন্যান্য উন্নয়মূলক কর্মকাণ্ডের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বাহা উৎসব কৃষির পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, বনাঞ্চল এবং জলাভূমির সংরক্ষণের প্রতি মানুষকে সচেতন করে।

বাহা উৎসবের চ্যালেঞ্জ ঃ—

বাহা উৎসব পালনের মধ্যে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। আধুনিক সভ্যতা এবং নগরায়ণের কারণে অনেক আদিবাসী জনগণ তাদের ঐতিহ্যগত জীবনযাত্রা হারিয়ে ফেলছে। বাহা উৎসবের মতো ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানগুলো আজকাল বিলুপ্তির পথে, কারণ — তরুণ প্রজন্ম তাদের ঐতিহ্য ভুলে যাচ্ছে এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। এর ফলে, বাহা উৎসবের মতো উৎসবগুলো যদি সংরক্ষণ করা না যায়, তবে এটি ভবিষ্যতে শুধু ইতিহাসের পাতায় রয়ে যাবে।

এছাড়া, পরিবেশের পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং খাদ্য উৎপাদনের সমস্যা বাহা উৎসবের আয়োজনেও প্রভাব ফেলছে। তবে, এসব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, অনেক আদিবাসী সম্প্রদায় তাদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির অভাব হিসেবে বাহা উৎসবকে রক্ষা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বাহা উৎসব একটি অন্যতম সাংস্কৃতিক উৎসব, যা বাংলাদেশে এবং ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী জনগণের মাঝে পালিত হয়। এটি একটি কৃষি উৎসব হিসেবে প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতার এবং মানুষের একতার পরিচায়ক। বাহা উৎসবের মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য এবং কৃষি জীবন তথা সমাজের ঐক্যবদ্ধতা সম্পর্কে নতুন ধারণা লাভ করি। যদিও আধুনিকতার প্রভাবে এটি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তবুও বাহা উৎসবের গুরুত্ব এবং তা সংরক্ষণের প্রয়াস ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অব্যাহত রাখতে হবে।

বিহু-উৎসব আসামের গৌরব

প্রীতম সাহা (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

আসাম, ভারতের উত্তর-পূর্বের একটি রাজ্য, সংস্কৃতির একটি উৎপত্তিস্থল, বিহু উৎসবের মধ্য দিয়ে আসামের বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতির সংমিশ্রণ ঘটে থাকে। এই উপজাতিগুলি সমগ্র আসাম জুড়ে বসবাস করে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিহু আসামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসবে পরিণত হয়েছে।

বিহু আসামের কৃষি ঐতিহ্যবাসী উৎসব। আসামের ৭৫ শতাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। ফসল কাটার মরশুমের শুরুতে এবং শেষের দিকে এই উৎসব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পালিত হয়। উদ্‌যাপনটি ধান চাষের তিনটি পর্যায়ের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। সেগুলি হল বহাগ বিহু, কাটি বিহু ও মাঘ বিহু। বিহু হল ঋতু পরিবর্তনের ইঙ্গিত। তিনটি বিহু উদ্‌যাপনের প্রত্যেকটির নিজস্ব সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য রয়েছে এবং নিজস্ব ঐতিহ্যের সাথে উদ্‌যাপিত হয়। বসন্ত ঋতুর শুরুতে উৎসব হল বহাগ বিহু, কাটি বিহু এর সাথে যুক্ত আশ্বিনা সংক্রান্তিতে শারদীয় বিহু। মাঘ বিহু পৌষ মাসে শীতকালীন সময়ের সাথে জড়িত।

বহাগ বিহুতে চাষিরা চাষের জন্য মাঠ প্রস্তুত করে। বহাগ বিহু যা রোঙ্গালি বিহু নামে পরিচিত, আনন্দ এবং উল্লাসের প্রতিনিধিত্ব করে এবং এটি অসমীয়া নববর্ষ এবং বসন্তের আগমনের সূচনা করে।

কাটি বিহুকে কাঙ্গালি (দারিদ্র) বিহু বলা হয়। আসামের কৃষকদের জীবনে এটি একটি সংকটময় পর্যায়। এর মধ্য দিয়ে আসামের কৃষকরা ঈশ্বর-এর আশীর্বাদ লাভ করার চেষ্টা করে; যাতে ফসলের কোনো ক্ষতি না হয় ও কৃষকরা প্রচুর ফসল পেতে পারে। তাঁরা ধান ক্ষেতে বাতি জ্বালিয়ে কীটপতঙ্গের হাত থেকে ধানকে রক্ষা করে। লম্বা বাঁশ-এর মাথায় বাতিগুলি লাগানো হয়ে থাকে। ফসল-এর সুস্থতার জন্য কৃষকরা প্রার্থনা করে। এই বাতি ধান ক্ষেতে কীটপতঙ্গাদের আকৃস্ট করে এবং সেই বাতির আগুনে তাদের মৃত্যু ঘটে।

মাঘ বিহুতে কৃষকদের ফসল কাটা ও সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়। উৎসবটি বোঝায় যে, কৃষকদের তাদের ফসল নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই, প্রচুর ফসল ইতিমধ্যে কাটা হয়েছে। মাঘ বিহুকে ভোগালি বিহু বলা হয়। এর অর্থ হল — উপভোগ করা। আসামের জনগণ এই মাঘ বিহুকে উৎসাহের সাথে উদ্‌যাপন করে।

বিহুর উৎপত্তি ঃ—

পৌরাণিক বেশ কিছু কাহিনি রয়েছে যা বিহুর উৎসবের সাথে সম্পর্কিত। এই উৎসব যেন প্রাচীনকাল থেকেই আসামের কৃষিজীবি মানুষ-এর সাথে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত রয়েছে। বিহু উৎসবটি প্রায় ৫০০০ বছরের বেশি পুরনো। উৎসবটি অস্ট্রো এশিয়ার লোকেরা শুরু করেছিল, যারা আসামের প্রাচীনতম বাসিন্দা ছিল। এদের বসবাস ছিল ৩০০০ খ্রি. পূর্বাব্দ থেকে ১০০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত। অন্যদিকে বিহু উৎসবটি তিব্বত-বর্মণ লোকেরা শুরু করেছিল আশা করা যায়। তারা ১০০০ খ্রিঃ পূর্বে আসামে আসেন। সময়-এর সাথে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে

এখন আসামের বহু-জাতি, বহু-ধর্মীয়, বহু-ভাষার মানুষের বসবাস। এখানে রয়েছে তিব্বতি-বর্মণ, ইন্দোআর্য, কুকি-চিন, চা বাগানের শ্রমিক ইত্যাদি। তাদের প্রায় সকলেই আনন্দের সাথে বিহু উৎসব উদ্‌যাপন করে।

গ্রামীণ উৎসব থেকে আসামের জাতীয় উৎসবের মর্যাদা লাভ ঃ—

রুদ্র সিংহ অহোমের রাজা। তিনি প্রথমবারের মতো বিহু উৎসবকে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন। শস্যভাণ্ডার খাদ্যে ভরা, সেই কারণে সেনাবাহিনী উন্মুক্ত মন নিয়ে এই উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করেছিল। তাঁরা এটিকে একটি কৃষি নববর্ষ হিসাবে পালন করেছিল। বিহু তার সূচনার পর থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে এর বিকাশ ঘটে। বিহু নৃত্যে উভয় লিঙ্গের মানুষের অংশগ্রহণ উল্লেখ যোগ্য পরিবর্তন। এখন যেখানে নারী ও পুরুষ একত্রিত হয়ে উৎসবে অংশগ্রহণ করে, কিছু কাল আগে নারী ও পুরুষ দূরত্ব বজায় রেখে উৎসবে অংশ নিত, একই সঙ্গো থাকলে যা সমাজে গ্রহণযোগ্য ছিল না। পরবর্তীকালে ব্রিটিশদের আসামে আগমন বিহু উৎসবের কিছুটা পরিবর্তন ঘটায়। যেখানে নারী ও পুরুষ-এর একত্রে অংশগ্রহণ এবং বুদ্ধিজীবিদের উত্থান ঘটে। সমাজের কিছু বিশেষ ব্যক্তি এই উৎসবকে তুলে দেওয়ার জন্য ব্রিটিশদের উস্কানি দিত। ফলস্বরূপ ব্রিটিশরা এটিকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু মানুষের প্রতিবাদে উৎসব চলতে থাকে ও সময়-এর সঙ্গো সঙ্গো আসামের জনগণের জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়।

বিহু উৎসবের বৈশিষ্ট্য ঃ—

বিহু উৎসবটি চমৎকার ভাবে সমৃদ্ধ। এখানে রয়েছে ‘সঙ্গীত, নাচ, খেলা, ঐতিহ্যবাহী খাবার, প্রথাগত মিষ্টি। ঐতিহ্যবাহী নৃত্যগুলি বিহুনাচ নামে পরিচিত।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দিক থেকে বিহু নাচ ও গান একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ১১,৩০৪ জন নর্তকী বিহুনাচ ও ঢোল বাদকের সাথে ১৩ এপ্রিল, ২০২৩ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে তাঁর স্থান নিশ্চিত করেছে। আসাম-এর বেশিরভাগ মানুষ বিহু নাচ ও গান করতে পারে। এর জন্য তারা গর্বিত। এই বিহু অসমীয় জাতি সংস্কৃতির পরিচায়ক হিসাবে বিবেচিত হয়।

বিহু উৎসবের বিবরণ ঃ—

তিনটি বিহু উৎসবে ৪০টিরও বেশি আচার নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্পাদিত হয়। উৎসবের মধ্য দিয়ে শুধু জনগণের ধর্মীয় দিকটি ফুটে ওঠে না; এর সাথে প্রকাশ পায় তাদের সংস্কৃতি, জ্ঞান ও পেশাগত দক্ষতা।

বিহুর কিছু আচার অনুষ্ঠান ঃ—

* গরু ও বলদ ধোয়া।
* কৃষি যন্ত্রপাতি পরিষ্কার।
* পোকামাকড় তাড়ানোর জন্য ধান ক্ষেতে বাতি জ্বালানো।
* ফসলের জন্য সর্বশক্তিমানকে ধন্যবাদ দেওয়া।
* বয়ন সরঞ্জাম-এর পরিষ্কার প্রভৃতি।
* খালি পেটে তেতো খাবার খাওয়া।

এছাড়াও আরও অনেকগুলি আচার অনুষ্ঠান এই উৎসবে পালন করা হয়।

বিহু নৃত্যের বৈশিষ্ট্য ঃ—

১। সাধারণ ছন্দ —

নৃত্যটি মূলত ৩.৫ মাত্রার একটি তাল। এটি হিন্দুস্থানী সঙ্গীত খেমটা তালের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

২। সাধারণ নড়াচড়া —

নৃত্যটিতে সাধারণত ছন্দ বজায় রেখে ছোটো ছোটো পদক্ষেপে সঞ্চালিত হয়।

৩। সাধারণ কোমর বাঁকানো —

সাধারণ ছন্দ বজায় রেখে শিল্পীরা কোমর বাঁকান। ৩.৫ মাত্রার তালে সাধারণত ২বার কোমর বাঁকাতে হয়।

৪। মহিলাদের সাধারণ ভঙ্গি —

মূলত নৃত্যে মহিলাদের সাধারণ কোনো ভঙ্গি ছিল না। স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহিলারা নাচতেন ও বিহু উৎসব পালন করতেন। বর্তমানে মহিলাদের সাধারণ নৃত্যের ভঙ্গিকে চিহ্নিত করা হয়েছে সাধারণ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সঞ্চালনের জন্য।

বিহু গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ—

বিহু গানকে বলা হয় বিহুগীত। এর মধ্য দিয়ে অসমিয়া সংস্কৃতির ঐতিহ্য প্রবাহিত হচ্ছে। সব দিক থেকে এই গানটি উচ্চমানের। অনেক কাল আগে থেকে বিহুগান রচিত হচ্ছে, যা এখনও পর্যন্ত চলছে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে —

* বিহুগান-এর মধ্য দিয়ে আসামের কৃষিজীবনের প্রতিফলন দেখা যায়।
* বিহুগানের পিছনে রয়েছে প্রেম।
* বিহুগান চমৎকার ভাবে রূপক দিয়ে সমৃদ্ধ।

বিহু উৎসবে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র ঃ—

বিহু নাচ এবং গানে মোট সাতটি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। যেখানে — বিহুঢোল, টৌকা, গোগোনা, হুটুলি, পাতি-তাল এবং বাঁহি।

*** রতি বিহু এবং গভরু বিহু —**

বহাগ বিহু উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে প্রকৃতির মধ্যখানে রতি ও গভরু বিহু অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে পরিবর্তিত হয়ে এখন সেটা আর প্রকৃতির মাঝখানে খুব কম অনুষ্ঠিত হয়।

*** রতি বিহু —**

প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেরা ও মেয়েরা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে অংশগ্রহণ করেন। নাচ ও গান-এর পরিবেশন করা হয়। ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়। টোকা, গোগোনা এবং হুটুলি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

*** গভরু বিহু —**

প্রকৃতির মাঝখানে অনুষ্ঠিত হত, প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরা বিহুনাচ পরিবেশন করত। এখানে পুরুষরা অংশ নিতে পারত না।

রতি এবং গভরু বিহুর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন গৌরবময় ঐতিহ্য এবং এর পাশাপাশি এর মধ্য দিয়ে কৃষিনির্ভর সমাজের নারীদের উচ্চ-মর্যাদার প্রকাশ দেখা যায়। রতি এবং গভরু বিহু আয়োজন করত মেয়েরা।

হুনছাড়ি —

যে দল হুনছাড়ি পালন করে তাকে হুছরি দল বলে। সাধারণত একটি গ্রামে একটি হুছরি দল আয়োজন করা হয়। গ্রামের পরিবারের উঠানে হুনছাড়ি পালন করা হয়। এর মধ্য দিয়ে পরিবার আশীর্বাদ লাভ করে। এই অনুষ্ঠানে মূলত পুরুষরাই অংশ নিত। বর্তমানেও এর প্রচলন রয়েছে।

বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে ঐতিহ্যবাহী উৎসবগুলির অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ছে। বিহু উৎসব-এর ক্ষেত্রেও এর একই রকম প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এখন পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যবাহী গান-এর পরিবর্তে আধুনিক গানগুলি আরও বেশি করে প্রচারিত হচ্ছে। লোকশিল্পীদের পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিল্পীদের আরও বেশি করে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। এর ফল হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, আসামের নতুন প্রজন্ম এর মানেই যেন ভুলতে বসেছে পাশ্চাত্যের প্রভাবে। তাই প্রয়োজন রয়েছে ঐতিহ্যবাহী গান ও নৃত্যগুলির সংরক্ষণের।

মা-বাবাকে ভুলে যেও না

তুফানচন্দ্র দাস (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

সবাইকে ভুলে যেও
কিন্তু মা-বাবাকে ভুলে যেও না।
পাথরকে পুজো করেছে তোমার জন্মের জন্য,
পাথর হয়ে মা-বাবার মন কখনও ভেঙ্গো দিও না।
নিজে না খেয়ে যারা
তোমাকে বড় করলো,
অমৃত খাওয়ালো তাদের জন্য কখনও
বিষ প্রয়োগ করো না।
সম্পত্তি অনেক পাবে,
কিন্তু মা-বাবা পাবে কি?
পবিত্র চরণের মূল্য
কখনও ভুলে যেও না।

বিদ্যাসাগর ও বাঙালি আধুনিকতা

ড. কৌশিক চট্টোপাধ্যায় (অধ্যাপক)

বিশ শতকের অস্থির যন্ত্রণা কাতর যুগপর্বে কবি জীবনানন্দ তাঁর প্রপিতামহের দিনকালের দিকে তাকিয়েছেন। ১৯৪৬-৪৭ শিরোনামের কবিতায় জীবনানন্দ বলছেন, এর চেয়ে ভালো ছিল প্রপিতামহের যুগ। ঊনিশ শতকের আগে সে এক স্পষ্ট যুগ ছিল বটে। পৃথক এক স্পষ্ট জগতের অধিবাসী ছিলেন প্রপিতামহের দল। সে যুগে স্পষ্ট ছিল সুখ আর দুঃখের একমাত্রিক জীবন বিন্যাস। স্থির স্থবির অর্থনীতি। বদ্ধমূল ধর্মীয় বিশ্বাস। প্রথা, সোজাসাপটা বিনোদন, কুসংস্কার ও অশিক্ষার অন্ধকূপে নিমজ্জিত এক সরল জীবন। বাঙালির জীবনে ইংরেজের আগমন সেই স্থির ও তথাকথিত 'সরল' জীবন বিন্যাসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। কলকারখানা অধ্যুষিত অর্থনীতি, জীবনে নতুন চলমানতার সূত্রপাত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, পাশ্চাত্যের ছোঁয়া বাঙালির স্থবির জীবনকে আন্দোলিত করে দেয় এক ভিন্নতার অভিমুখে। সেই ভিন্নতার স্রোতকে ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে দাঁড়িয়ে শত সহস্র ধারায় চলচ্ছক্তি হীন সমাজের বুকে প্রবাহিত করার জন্য যাঁরা শঙ্খ বাজালেন তাঁরা হলেন রামমোহন-বিদ্যাসাগর এবং আরও অনেকেই। এই ভিন্নতার সুরেই প্রস্ফুটিত হচ্ছে ঊনিশ শতকের বাঙালির আধুনিকতা, যার সূত্রপাত করছেন রাজা রামমোহন রায়, পরবর্তীতে বিদ্যাসাগর।

বাঙালি আধুনিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে রামমোহন-বিদ্যাসাগর এভাবে একত্রে দুটি নাম উচ্চারিত হবার কারণ আছে। ইতিহাসের এক অদ্ভুত সমাপতন হলো এই, রামমোহন জন্মাচ্ছেন অত্যন্ত গোঁড়া এক হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে। পিতা মাতার ধর্মান্ধতার কারণে যুক্তিবাদী 'অবাধ্য' রামমোহন কৈশোরেই বাড়ি থেকে বিতাড়িত হচ্ছেন। সমাজের অন্ধত্বের বিরুদ্ধে লড়াই-এর আগেই রামমোহনকে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে পরিবারের রক্তচক্ষুর সামনে। পিতার শ্রাদ্ধের অধিকার পর্যন্ত তিনি পান নি। পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকেও প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন তিনি। ঠিক এইভাবে না হলেও সংস্কারক বিদ্যাসাগরও জন্মাচ্ছেন ধর্মপ্রাণ এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। অতীতের প্রথা ও বিশ্বাসের মধ্যে বড়ো হয়েছেন তিনিও। পরিবারের বিরোধিতার সম্মুখীন তিনিও হয়েছেন নানাভাবে, জীবনভর। দুজনকেই সমাজে আধুনিকতার প্রতিষ্ঠায় দাঁড়াতে হয়েছে রক্ষণশীল উন্মাদ দানবের সামনে। অন্ধ স্থবিরতাপ্রেমী সমাজ তাঁদের ছেড়ে কথা বলেনি। তিব্বতে থাকাকালীন সময়ে তিব্বতী নারীর স্নেহকোমল আশ্বাস ও নিরাপত্তার স্পর্শে লামা দস্যুদের হাত থেকে প্রাণ ফিরে পাওয়ার ঘটনায় রামমোহন যেমন নারীমুক্তির কাজে লাভ করেছিলেন প্রবল অনুপ্রেরণা তেমনি বিদ্যাসাগরের নারীমুক্তির কাজের প্রেরণা ছিল ভগবতচরণের কন্যা রাইমণির কোমল মাতৃস্নেহ আর তার বৈধব্য জীবনের অবর্ণনীয় কষ্ট। আমাদের আজকের আলোচনার অভিমুখ বিদ্যাসাগর ও বাঙালি আধুনিকতা। যে বিদ্যাসাগর নির্ভীক প্রতিবাদে তাঁর সমকালকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি; নিজের বা সমাজের মঙ্গালের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব। লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সংকুচিত হইব না।' (মৃধা দেবাশিস (সম্পা), ঈশ্বরচন্দ্র ঃ সৃজনে মননে, জিয়নকাঠি প্রকাশন, পৃঃ ২২)

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে বলছেন ঃ

"তাঁর দেশের লোক যে যুগে বন্ধ হয়ে আছেন বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড় যুগে তাঁর জন্ম, যার মধ্যে আধুনিক কালের স্থান আছে, যা ভাবীকালকে প্রত্যাখ্যান করে না। যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে; বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল; এই জন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ১৫শ, পৃঃ ১৬১) এ হেন আধুনিক বিদ্যাসাগর বাঙালি জীবনে আধুনিকতার প্রতিষ্ঠায় কিভাবে জীবনপাত করেছেন, সেই বিষয়টির উপরেই আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করার আগে থেকেই নিয়ম ছিল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সন্তানেরাই শুধুমাত্র সংস্কৃত শিক্ষার অধিকারী হবেন। বিদ্যাসাগর অধ্যক্ষ হয়ে আসার পরেই বললেন, 'এ নিয়ম তুলে দাও কারণ সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র ছাড়াও এই ভাষায় বিশাল এক ক্ষেত্র আছে, এই ক্ষেত্রে বা জগতে জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের প্রবেশের অধিকার আছে।' কিন্তু ব্যাপারটি সহজসাধ্য হলো না মোটেও। প্রবল বাধা ও প্রতিরোধের মধ্যে পড়লেন বিদ্যাসাগর। একদিকে তিনি একা আর অন্যদিকে যাবতীয় পণ্ডিতের দল। ভয়ঙ্কর দুর্দমনীয় বিদ্যাসাগর সব বাধাকে অতিক্রম করে জয়ী হলেন। সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল সবার জন্য। শুরু হলো আধুনিক চিন্তার, মুক্ত চিন্তার কর্মযজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, বিদ্যাসাগর আচারের দুর্গকে আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর বাঙালি আধুনিকতা প্রতিষ্ঠায় প্রথার দুর্গে আক্রমণ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা দুটি প্রধান বিষয় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই। একটি হলো ঘৃণ্য কুলীন বহুবিবাহ প্রথা আর অন্যটি হলো নারকীয় বৈধব্য প্রথা। বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কুল রক্ষার জন্য এক পাত্রে অনেক কন্যাদানের ঘৃণ্য রীতির মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিলেন তিনি। ঈশ্বরচন্দ্রের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন। তিনি লিখলেন, 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নামের নাটক। এ কথা বলাই বাহুল্য, বহুবিবাহ প্রথার কুফল হিসেবে সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল অগুণতি বাল্য বৈধব্য। বাল্যবৈধব্যের চরম অসহায়তা, পাশবিক আচারের অত্যাচার, নির্যাতন, পীড়ন, ব্যভিচার, আত্মহত্যা। সেই সময় কাশী বৃন্দাবন বাঙালি বিধবায় ভরে উঠেছিল, যাদের অবস্থা ছিল অবর্ণনীয় যন্ত্রণাময়। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহকে আক্রমণ করে বই লিখলেন। লিখলেন, বহুবিবাহ শাস্ত্রবিরোধী কুৎসিত এক প্রথা। কুলীন ব্রাহ্মণদের বিদ্ধ করলেন তাঁর লেখার মাধ্যমে। তিনি লিখলেন, 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদবিষয়ক বিচার' (১৮৭১)। লিখলেন, 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদবিষয়ক বিচার, দ্বিতীয় পুস্তক', (১৮৭৩) বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ প্রথা বিরোধী লেখাতে ক্ষুব্ধ হয়ে বিরোধিতার কলম ধরলেন তারানাথ তর্কবাচস্পতি নামের এক পণ্ডিত। সংস্কৃতে লেখা এই বইটিতে দুর্বল যুক্তির বহর দেখে মজা পেলেন বিদ্যাসাগর। লিখলেন, 'অতি অল্প হইল'। উঁচু জাতের রসিকতা ও ব্যঙ্গে বিদ্ধ করলেন তারানাথ বাচস্পতিকে। বহুবিবাহ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকারের কাছে নানা ভাবে আবেদন জমা করা হয় যার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সেই সময় নিয়ম ছিল, মেয়েদের খুব অল্প বয়সে বিয়ে দিতে হবে, মেয়ের ঋতুস্রাব আরম্ভ হবার আগে। তার আগে বিয়ে না দিতে পারা পাপ। কিন্তু যখন অভিযোগ আসে, ফুলমণি নামের এক বালিকা বধুর মৃত্যু হয় স্বামীর জোরপূর্বক সংসর্গ করার চেষ্টার ফলে, সংস্কারকেরা দাবি তুললেন, মেয়েদের

বিবাহের বয়স দশ থেকে বাড়িয়ে বারো করার জন্য। বিদ্যাসাগর বললেন, মেয়েদের বাল্যবিবাহ অযৌক্তিক। বালিকা বধূর উপর নির্মম অত্যাচারের জন্য এই প্রথা হলো স্বামীদের সামাজিক অনুমতি প্রদান। এই প্রথা বন্ধ হওয়া উচিত। শাস্ত্রপ্রমাণ উপস্থাপন করে তিনি এই বিরুদ্ধতাকে প্রতিষ্ঠা করলেন। বাল্যবিবাহের যে মারাত্মক অন্ধকার দিকগুলি বিদ্যাসাগর নির্দিষ্ট করে সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন, সেগুলো হলো ঃ—

১। শারীরিক পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বেই বিবাহের কারণে নানা রোগে আক্রান্ত নারীজাতি।

২। অপুষ্ট সন্তানের জন্মদান।

৩। বাল্যবিধবার সংখ্যাবৃদ্ধি।

বৈধব্য প্রথার নারকীয়তা নাড়িয়ে দিয়েছিল বিদ্যাসাগরের জীবন। তিনি জীবনের সব থেকে বড়ো কাজটি করতে চেয়েছিলেন এই প্রথার মূলোচ্ছেদ করার মধ্য দিয়ে। চালু করতে চাইলেন, বিধবা বিবাহ। একেবারেই সহজ ছিলো না এই দুর্গম পথের অভিযাত্রা। নির্ঘুম রাত্রি জাগরণে ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টায় তিনি পথ খুঁজেছেন। শাস্ত্রে বিধবা বিবাহ আছে কি নেই — এই প্রশ্নের উত্তর তিনি হাতড়েছেন অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে। তারপর একদিন হঠাৎ সেই আলোর ঝলকানি। তিনি পেলেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত শ্লোক ও তার অর্থ। খুঁজে পেলেন পরাশর সংহিতার তিনটি শ্লোক ঃ—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎ সু নারীণাং পতিরণ্যো বিধীয়তে।।

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা
সামৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ।।

তিস্রঃ কোট্যোহর্ধকোটী চ যানি রোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে ভর্তারং যানুগচ্ছতি।।

অর্থ ঃ ১। স্বামী নিরুদ্দেশ হলে, মারা গেলে, ক্লীব প্রতিপন্ন হলে, সংসার ত্যাগ করলে অথবা পতিত হলে স্ত্রীদের পুনর্বিবাহ হতে পারে শাস্ত্র মতে।

২। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ব্রহ্মচর্য পালন করলে, সে দেহান্তে স্বর্গলাভ করবে।

৩। যে নারী স্বামীর সহগমন করে, সে সার্ধ ত্রিকোটি কাল স্বর্গে বাস করবে।

অর্থাৎ, পরাশরের বিধান কলিযুগের বিধবাদের জন্য — পুনর্বিবাহ, ব্রহ্মচর্য এবং সহগমন।

কলিযুগে ব্রহ্মচর্য পালনের কারণে ঘরে ঘরে ব্যভিচার, ভ্রূণ হত্যার মতো পাপ ঘটে। ব্রহ্মচর্য পালন করা এই যুগে এক কঠিন প্রস্তাব। অন্যদিকে সহগমন, রাজা রামমোহন আগেই বন্ধ করতে পেরেছেন। সেই কারণে সর্বোত্তম প্রস্তাব হলো বিধবাদের পুনর্বিবাহ। বিদ্যাসাগর প্রবন্ধ রচনা করলেন। 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫)। লিখলেন, 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদবিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব' (১৮৫৫)। বিদ্যাসাগরের দীর্ঘ পরিশ্রমের ফলে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। ঋষি অরবিন্দ লিখেছেন, 'Vidyasagar, scholar, sage and intellectual dictator, labored hugely like the Titan was to create a new Bengali Society.' (মৃধা, দেবাশিস (সম্পা)) জিয়ন কাঠি প্রকাশন, পৃ ১৮)

ধর্মরক্ষক গুণ্ডাদের উন্মত্ত রক্তচক্ষুর সামনে নির্ভীক ছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর তেজের সামনে দৌড় মেরে পালিয়েছে, হার মেনেছে অন্ধকারের দস্যুরা। বিধবাবিবাহের আইন পাশ হবার পর বিদ্যাসাগর যখন দেখলেন প্রথম বিধবা বিবাহের রাত্রে, বর্ধমান জেলার পলাশডাঙা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশম বর্ষীয়া বিধবা কন্যা কালীমতির নতুন বর দেখতে ভীড় করেছে মেয়েরা, তখন তাঁর স্বপ্ন ও সংগ্রামের এগিয়ে চলা প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বিদ্যালয় স্থাপন, দীনদান ইত্যাদি মহান কর্ম করতে গিয়ে নিজ অর্থ সঞ্চয় সমাপ্ত করে বহুবিধ ঋণের জালে জড়িয়ে যান বিদ্যাসাগর। তবু পিছ পা হন নি। তখনকার সময়েও ষাট জন বিধবা নারীর বিয়েতে প্রায় বিরাশি হাজার টাকা ব্যয় করেন। এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থব্যয় তো ছিলোই।

বাঙালি আধুনিকতার জয়যাত্রায় বিদ্যাসাগরের অন্যতম চরম কৃতিত্ব নারীশিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান। বিদ্যাসাগর স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কিত কাজ শুরু করার কিছুকাল আগে থেকেই বাংলায় এ ব্যাপারে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল ‘ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি’ নামের খ্রিস্টান মহিলা সমিতি। স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে এঁরা প্রচেষ্টা শুরু করেন। এছাড়াও ১৮১৮-তে রবার্ট মে চুঁচুড়াতে বালিকা বিদ্যালয় তৈরি করেন। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কলকাতার গৌরীবেড়ে, জানবাজার, চিৎপুর প্রভৃতি এলাকায় আটটি মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ও ব্যবস্থাপনায় বাঙলার স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু গুণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তিনিই প্রথম উচ্চবংশজাত বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোক যিনি স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক সরকারী প্রথামাফিক কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সরকারের পক্ষ থেকে হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরকে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের বিষয়ে কাজ করার জন্য বিশেষ দায়িত্ব দেন। ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৮-এর মধ্যে বিদ্যাসাগর নিজের এলাকাভুক্ত হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ১৫টি বা তার বেশি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তীতে আরও অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন তিনি। স্ত্রী শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের চিন্তাচেতনার ও কর্মপদ্ধতির বিশেষত্বের দিকগুলি এই রকম —

ক) বিদ্যাসাগর যতদিন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, এর মধ্যে এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠা করেন যে, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়টি কোনো উদার হৃদয় ও বিত্তশালী ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছাধীন উদ্যোগের ব্যাপার নয়, এটি একটি জাতীয় সমস্যা তথা প্রশাসনিক দায়।

খ) বিদ্যাসাগরের চেষ্টাতেই বালিকা বিদ্যালয়গুলির পঠন ও পাঠন পদ্ধতিতে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ) বিদ্যাসাগর স্থাপিত চল্লিশটি বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে পঁয়ত্রিশটি বিদ্যালয় সরকারী গ্রান্ট পায়নি। যে বালিকা বিদ্যালয়গুলি সরকারী গ্রান্ট পায় নি, সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়গুলির প্রতি মমত্ববোধে ‘নারী শিক্ষা ভাণ্ডার’ নামে তহবিল গঠন করেছিলেন।

ঘ) সমস্ত প্রগতি ও আধুনিকতার উদ্যোগকে সমাজের মানসের পরিবর্তনের অপেক্ষায় না রেখে প্রাতিষ্ঠানিক (ইন্সটিটিউশনাল) করে তোলবার চেষ্টা করতেন বিদ্যাসাগর।

ঙ) মানুষকে যুক্তিবাদী ও মুক্তবুদ্ধি করে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। বিদ্যাসাগরের স্ত্রী শিক্ষা প্রচেষ্টার মধ্যেও এই উদ্দেশ্যটিই জাজ্বল্যমান ছিল।

চ) বিদ্যাসাগরের পরামর্শেই মেয়েদের হাতের লেখা অভ্যেস, পাটিগণিত, পদার্থবিজ্ঞান, ভূগোলের পাশাপাশি সূচিকর্ম শেখানো হতে থাকে। বাংলা ভাষার পাশাপাশি অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে ইংরেজি শিক্ষাও দেওয়া হতে থাকে।

ছ) বিদ্যাসাগরের স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় প্রচেষ্টার মূলে নারী ও পুরুষকে সমানাধিকারী দেখার ইচ্ছা ছিল প্রবল। তাঁর নারীমুক্তি আন্দোলনের অঙ্গ ছিল স্ত্রীশিক্ষা।

জ) তিনি সর্বজনীন জনশিক্ষার সাথে সাথে নারীশিক্ষাকেও একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করেন।

শিক্ষা সংস্কারের মধ্য দিয়েও বাঙালি আধুনিকতার নতুন অভিমুখ রচনা করেন বিদ্যাসাগর, যা নবজাগৃতির যুগে অত্যন্ত গুরুত্বের স্বাক্ষর বহন করে। শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক সামন্তবাদী ধ্যানধারণা ও সেগুলি ব্যবহারের যথাসাধ্য বিরোধিতা এবং শিক্ষা সংস্কার বিদ্যাসাগরের অবিস্মরণীয় কীর্তি। 'নোটস অন দ্য স্যান্সক্রিট কলেজ' শিরোনামে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল বিদ্যাসাগর বিশেষ ভাবে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ে ২৬ অনুচ্ছেদ সম্বলিত একটি খসড়া প্রণয়ন করেন। এই খসড়ার মধ্যে তাঁর প্রাচ্য ও পাশচাত্যের সমন্বয়ধর্মী শিক্ষাচিন্তার মূল স্বরূপটি দেখা যায়। আমাদের মতো করে সেগুলির মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা এই নিবন্ধে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যেমন ঃ—

১। বাঙলাদেশে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার যারা নেবেন, তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত উন্নত ও সমৃদ্ধ বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।

২। যাঁরা ইউরোপীয় আকর থেকে জ্ঞান বিদ্যার উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবেন না, তাঁরা এই সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।

৩। যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নন, তাঁরা প্রাঞ্জল বাংলা লিখতে পারবেন না।

৪। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজি সাহিত্য ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তারাই একমাত্র সুসমৃদ্ধ সাহিত্যের শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে।

৫। পাশ্চাত্য দর্শনের ভাবধারা বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করতে হলে যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা জানা দরকার, তা পণ্ডিতদের আয়ত্তে থাকবে।

উপর্যুক্ত এই কয়েকটি সূত্রের নিরিখে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় তা হলো, বিদ্যাসাগর আধুনিক সমাজের লক্ষ্যে সংস্কৃত চর্চার গুরুত্বের পাশাপাশি মাতৃভাষার সমৃদ্ধ চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পাশচাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চার উপর অসম্ভব গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন ঃ বিদ্যাসাগর আচারের দুর্গকে আক্রমণ করেছিলেন, এই তাঁর আধুনিকতার একমাত্র পরিচয় নয়। যেখানে তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সেতুস্বরূপ হয়েছিলেন সেখানেও তাঁর বুদ্ধির ঔদার্য প্রকাশ পেয়েছে। (বিদ্যাসাগর স্মৃতি ঃ রবীন্দ্রনাথ) গবেষক বিনয় ঘোষ বলছেন ঃ 'বিদ্যাসাগর ছিলেন মানবমুখীন শিক্ষানীতির প্রবর্তক। মানুষ গড়ে তোলাই ছিল তাঁর নির্ভীক শিক্ষা সংস্কারের একমাত্র লক্ষ্য।' বিনয় ঘোষ বিদ্যাসাগরকে হিউম্যানিস্ট সাহিত্য সাধক এই অভিধায় ভূষিত করেছেন। তথাকথিত নীচু তলার মানুষের শিক্ষার জন্যে বিদ্যাসাগরের মন উদবিগ্ন হয়েছিল। তিনি এ বিষয়ে

সক্রিয় ভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। অকাতরে অর্থব্যয়ও করেছিলেন তিনি। তাঁর স্বাজাত্যবোধ অসম্ভব উচ্চমানের ছিল। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার নির্ণায়ক হয়েছিল তাঁর স্বদেশপ্রীতি। তাঁর শিক্ষাসংস্কারের কয়েকটি বিষয় সূত্রাকারে উল্লেখ করে নেওয়া যায় ঃ—

* শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যবিরোধী ধর্ম নিরপেক্ষ মানবতার প্রতিষ্ঠা।
* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তার মিলন।
* বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রবর্তন।
* শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবমুখীন চেতনার বিকাশ।
* শিক্ষার প্রসারের জন্য মাতৃভাষার বিকাশ।
* পাঠ্যপুস্তক রচনা, পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ, প্রেস স্থাপন করে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ।
* দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন।
* উন্নত ধারায় স্বদেশী সাহিত্যের চর্চা।
* সহজ বাংলা ব্যাকরণ রচনা।
* ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে বিদ্যালয়ে উপযুক্ত যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের জন্য শিক্ষক নির্বাচনী পরীক্ষার প্রবর্তন।
* শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করার জন্য বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে নর্মাল স্কুল স্থাপন।
* শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তবতা ও প্রযোজ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
* শিক্ষাদানের নামে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তি প্রদানের বিরোধিতা।
* নাট্যচর্চা, সঙ্গীত, আবৃত্তি ইত্যাদি সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন বিদ্যাসাগর।
* শিক্ষাক্ষেত্রে হাতের কাজ ও খেলাধুলার উপর গুরুত্ব প্রদান।
* সরল বাক্যবিন্যাস রীতি নির্মাণ, অনুবাদ ইত্যাদির দ্বারা বাংলাভাষা ও সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে অসামান্য অবদান।

গবেষক বদরুদ্দিন উমর বলেছেন, "মীর মোশারফ হোসেন এবং তসলিম উদ্দীন আহমেদের মতো দু'চার জন উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত গদ্যরীতির দ্বারা উচ্চ ও মধ্য শ্রেণিভুক্ত মুসলমানরাও উপকৃত হয়েছিলেন।" তাঁরা সেই সময় 'মুসলমানি বাংলা' নামে কোনো উদ্ভট ভাষা সৃষ্টির প্রতি কোনোরূপ দৃষ্টি দেননি। (উমর বদরুদ্দিন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ) বিদ্যাসাগর যদিও মনে করতেন, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম বিধবাদের দুঃখ মোচন, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু মনে করতেন 'তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা'। তিনি যেমন সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়ে মানস পট বদলে দিয়েছিলেন বাঙালির, তেমনি ভাষার সংস্কারের মাধ্যমে তিনি মুক্ত করে দিয়েছিলেন বাঙলা সাহিত্য সংস্কৃতির জয়যাত্রার পথ।

প্রসঙ্গাত বিদ্যাসাগরের শিশুশিক্ষাকেন্দ্রিক প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর ময়েট সাহেবের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রতিবেদন পেশ করেন। তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলির কথা সবার জানা। তিনি রচনা করেন 'বর্ণপরিচয় (১৮৫৫), কথামালা (১৮৫৬), বোধোদয় (১৮৫৯)'। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন শিশুদের চরিত্রবান, সংযত, নীতিনিষ্ঠ, নিয়মানুবর্তী এবং সুসামাজিক করে গড়ে তোলা। তিনি চেয়েছিলেন, সুশৃঙ্খল শিশুসমাজ। মানবজীবনের ভিত গড়ে ওঠে শৈশবে। সেই শৈশবের যত্নে বিদ্যাসাগর ছিলেন দৃঢ় সংকল্প। তাঁর নীতি, উপদেশমণ্ডিত পাঠ্যপুস্তকগুলির অন্দরসজ্জা দেখলে সে কথাই আমাদের মনে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিষয় বলে নেওয়া প্রয়োজন, ব্যাপক জনশিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগরের আপত্তির বিষয়ে গবেষকেরা কেউ কেউ বিদ্যাসাগরের শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতার সন্ধান পেয়েছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় বিদ্যাসাগর ছিলেন তীক্ষ্ণ বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। দেশ কাল পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যতটা অর্জন করা সম্ভব, তিনি সেই ভাবেই তাঁর লক্ষ্যের অভিমুখ তৈরি করেছেন। অযথা আবেগের পরিবর্তে সম্ভাব্যতা, প্রযোজ্যতাই ছিল তাঁর মুখ্য বিচার্য বিষয়।

পরিশেষে বলা যায়, উনিশ শতকের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেও বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ্যবাদেরই বিরোধিতা করেছেন, শিক্ষা সংস্কারে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন, ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের পাহাড় ভেঙেছেন, প্রবল প্রখর যুক্তিবাদকে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের কল্যাণে প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্রেয় বিবেচনা করছেন, ভাষা ও সংস্কৃতির আড়ষ্টতার পরিসমাপ্তি ঘটাচ্ছেন, তাঁর এই যুগপ্লাবী অমিত শক্তিই আধুনিকতার সজ্জায় বাঙালিকে সজ্জিত করেছিল। বাঙালির জন্য নতুন আলোর পথ নির্মাণ করেছিল।

বসন্ত স্বাগতম

শোয়েব মণ্ডল (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

শুভ কোনো এক প্রভাত ক্ষণে
রক্তিম রবি দেয় রশ্মি পর্বত কোণে,
নরম পথের ধারে দাঁড়ায়ে রয়েছে বৃদ্ধ তরুবর
বিস্তারিয়া কচি নানা পল্লব, আরো কত পুষ্পে সরব।

শাল শিমূল পলাশ অশোকের ফাঁকে
কুহু কুহু রবে দুষ্টু কোকিল ডাকে;
ঈষৎ হলুদ সবুজ পাতার মাঝে
বাংলার বিশ্ব মেতে ওঠে নব সাজে।

বসন্ত আনে আনন্দ মানুষের মনে
থাকে যেন চির কোলাহল বাংলার প্রাণে।

মহাত্মা গান্ধী : প্রমথ চৌধুরীর চোখে

মলয়েন্দু দিন্দা (অধ্যাপক)

বাংলার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বা আরো সঠিকভাবে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে গান্ধীর সম্পর্ক একটি বহুল চর্চিত বিষয়; বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের টানাপোড়েন।[১] ব্যক্তি গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধার ভাব থাকলেও অনেক বাঙালি বুদ্ধিজীবী গান্ধীনীতি, বিশেষ করে তাঁর চরকা, খাদি-খদ্দরকে অন্ধভাবে মেনে নিতে পারেন নি। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বেশ কিছু গান্ধীভক্ত থাকলেও কয়েকজন তাঁকে মন্ত্রদাতা গুরু বলে স্বীকার করেন নি (যথা বিপিনচন্দ্র পাল, প্রমথ চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও অতুল গুপ্ত)। হালে এই বিষয়ে শার্বণী গুপ্ত-র গবেষণায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, হেমেন্দ্রলাল রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সরলা দেবীর কথা এলেও তৎকালীন একজন প্রধান বুদ্ধিজীবীর প্রসঙ্গ আসেই নি — যেটি খুবই আশ্চর্যের কথা।[২] তিনি হলেন *সবুজপত্র*-র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী। বস্তুত বাঙালির গান্ধী-বিরোধিতার সূত্রপাত হয় তাঁর হাত ধরেই। সম-সাময়িক তরুণ সমাজকে গান্ধী-বিরোধিতায় সবচেয়ে বেশি উদ্দীপিত করেন তিনিই।[৩] তাই গান্ধীর সঙ্গে সুভাষ ও রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি প্রমথ চৌধুরীর প্রসঙ্গও বিচার করা দরকার। এই কাজটি এখনও করা হয় নি। বর্তমান প্রবন্ধে অধুনা দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা (যেমন-*সবুজপত্র, আত্মশক্তি, বিজলী, শঙ্খ, অলকা*), ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও স্মৃতিকথার ভিত্তিতে এই অনালোচিত দিকটির ওপর আলোকপাত করা হলো।

গান্ধী : প্রমথ চৌধুরীর স্মৃতিকথায়

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) ও মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) সম-সাময়িক হলেও তাঁদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের বিশেষ খবর পাওয়া যায় না। বিশেষ করে গান্ধীজীর লেখাপত্রে প্রমথ চৌধুরীর কথা আসে নি — অন্তত আমার চোখে পড়ে নি। উল্টোদিকে, প্রমথ চৌধুরী স্বনামে ও বিনামে (বীরবল) গান্ধী ও কংগ্রেস সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে লিখে গেছেন কিন্তু গান্ধীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বা যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন নি। অবশ্য এর মানে এই নয় যে গান্ধীর সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর কোনো দিন সাক্ষাৎ বা মোলাকাৎ হয় নি। ১৯৩৯-এ *অলকা*-য় (মাঘ ১৩৪৬) তিনি একটি ছোট স্মৃতিকথা লেখেন — "বোম্বের নেতৃবৃন্দ" শিরোনাম দিয়ে।[৪] এতে তিনি ১৯০১-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ১৭তম কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষ্যে কোলকাতায় আসা বোম্বের নেতাদের কথা লেখেন। এই সময় বোম্বের নেতা যথা ফিরোজশা মেহেতা, মি. কামা ও চিমনলাল সেতলওয়াড প্রমথ চৌধুরীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই অনুষঙ্গে বোম্বাই প্রদেশের আরও কয়েকজন নেতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁদের মধ্যে গোপালকৃষ্ণ গোখলের নাম উল্লেখযোগ্য। রাজনীতির আলোচনায় মি. কামা, ফিরোজশা প্রমুখের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মতের মিল হতো না; বরং দেশের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে গোখেল ও সেতলওয়াডের সঙ্গে তাঁর ঘোর তর্ক হতো। প্রথম থেকেই গোখেলকে তাঁর মনে হয়েছিল একজন 'আইডিয়ালিস্ট'। এই গোখেলকৃষ্ণই ১৯০২-এর জানুয়ারি মাসে একদিন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর পরিচয় করিয়ে দেন — বালীগঞ্জের ১৯নং স্টোর রোডের বাড়িতে যেটি ছিল সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসভবন।

এই পরিচয় করিয়ে দেবার পেছনে গোখলের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। কথাবার্তার সময় গোখেল মহাশয় প্রমথ চৌধুরীকে প্রায়ই বলতেন যে তাঁদের অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরীদের মতো লোকের পলিটিকাল মতামতের কোনোই মূল্য নেই, কেননা স্বদেশের জন্য বা স্বজাতির জন্য তাঁদের কেনোরূপ শাস্তি ভোগ করতে হয় নি। মুখে এ কথার প্রতিবাদ না করলেও প্রমথ চৌধুরী মনে এ কথা গ্রাহ্য করতে পারেন নি। গোখেল মহোদয় তাঁকে গান্ধীর মতামত শোনাতে চেয়েছিলেন এই কারণে যে তিনি (গান্ধী) দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর উপর অত্যাচার দূর করার প্রচেষ্টায় — সে দেশের গভর্নমেন্টের হাতে যথেষ্ট শাস্তি ভোগ করেছিলেন। সংবাদপত্রের মারফৎ গান্ধীর কীর্তিকলাপ সব প্রমথ চৌধুরীর জানা ছিল এবং সেই কারণে গান্ধীর স্বজাতি-বাৎসল্যের প্রতি আর তাঁর চরিত্রবলের প্রতি প্রমথ চৌধুরীর ছিল প্রগাঢ় ভক্তি।

গোখেল মহোদয় প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে গান্ধীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ শাসন ও সভ্যতার উপর প্রমথবাবুর অনাস্থাসূচক মতামতের কথাও উল্লেখ করেন। সে মতামত গান্ধীর কাছে একেবারেই অগ্রাহ্য হলো, কেননা সেকালে ইংরাজ জাতির মহত্ত্বে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং প্রমথ চৌধুরী দেখলেন যে তিনি সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন যে, একমাত্র আবেদন নিবেদনের প্রসাদেই ভারতবাসী তাদের পলিটিকাল অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারবে। অবস্থা বুঝে প্রমথ চৌধুরী চুপ করে রইলেন, কারণ তিনি যখন গান্ধীর মত গ্রাহ্য করতে পারলেন না, তখন কিছু বলতে হলে তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে হয়। কিন্তু প্রথম পরিচয়ে একটা তর্ক শুরু করে দেওয়া ভদ্রতার নিয়ম নয়। তাছাড়া প্রমথবাবু স্পষ্টই দেখতে পেলেন যে গান্ধী মহোদয় তার্কিক শ্রেণীর লোক নন। সেদিনের কথা স্মরণ করে প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন :

> আমি যদি তাঁর কথার প্রতিবাদ করতুম তাহলে খুব সম্ভবত তিনি কেনো প্রত্যুত্তর করতেন না, কেননা তিনি একান্ত মিতভাষী। তারপর যাঁরা হাতে কলমে কোনো কাজ করেছেন তাঁরা কথা কাটাকাটি করতে স্বভাবতই নারাজ। আমার সঙ্গে তাঁর মতে না মিলুক, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্ধিহান হলুম যে তিনি এদেশের রাজনৈতিক দলের ভিতর একজন অগ্রগণ্য কর্মী। তিনি নিজের মত অনুসারে চলতে ও কাজ করতে যে তিলমাত্র দ্বিধা করবেন না, এ সত্য ঐ পাঁচ মিনিটের আলাপেই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।[৫]

এই স্মৃতিকথাটি প্রমথ চৌধুরী লেখেন খুব সম্ভবত ১৯১৯ কিম্বা ১৯২০-তে যদিও প্রকাশ করেন ১৯৩৯-এ। তাতে বোম্বের নেতাদের বিশেষ করে গান্ধীর যে মূল্যায়ন করেন প্রমথ চৌধুরী, তা মনে রাখা বিশেষ জরুরি :

> ... বোম্বের মডারেট নেতাদের মধ্যে সব চাইতে বেশি বুদ্ধিজীবী চিমনলাল সেতলওয়াড; সব চাইতে বেশি idealist গোপালকৃষ্ণ গোখলে আর সব চাইতে বেশি চরিত্রবান লোক হচ্ছেন শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ গান্ধী। এ মত আমি আজ পর্যন্ত পরিবর্তন করবার কোনো কারণ দেখতে পাই নি; যদিচ এদের মধ্যে কারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে আমি পারি নি। এই তিন ব্যক্তিতে যদি এক ব্যক্তি হতো, তাহলে আমি মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতুম।[৬]

অর্থাৎ গান্ধী যখন মহাত্মা হন নি তার আগে থেকেই প্রমথ চৌধুরী তাঁকে চিনতেন কিন্তু তাঁর মন্ত্রশিষ্য হন নি, যদিও তিনি আজীবন গান্ধীর প্রতি ছিলেন যথার্থই শ্রদ্ধাশীল।

মহাত্মা সন্দর্শনে প্রমথ প্রসঙ্গ

উল্টোদিকে গান্ধীজী যে প্রমথ চৌধুরীর সম্পর্কে কিছু জানতেন না বা খবরাখবর রাখতেন না — তাও ঠিক নয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা *চলমান জীবন*-এ। ১৯২০-র সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষ্যে গান্ধীজী কোলকাতার ৪নং পোলক স্ট্রীটে থাকছিলেন। ঐ সময় সরলা দেবী গান্ধীজীর কাছে যাবার জন্য প্রমথ চৌধুরীর মোটরগাড়িটি নেন আর সঙ্গে নেন *সুবজপত্র*-র ম্যানেজার পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়-কে। পবিত্রর পরিচয় পর্বে প্রমথ চৌধুরীর নাম শুনে এক মিনিট ভেবে নিয়ে গান্ধীজী জিজ্ঞেস করেন তিনি [প্রমথ চৌধুরী] অক্সফোর্ডে ছিলেন কিনা। তারপর বললেন, প্রমথ চৌধুরীর কথা তিনি আগেই শুনেছেন তাঁর বন্ধু মৌলানা মোহাম্মদ আলির কাছে। মৌলানা সাহেব গল্প-প্রসঙ্গে গান্ধীজীকে বলেছেন যে, যুবক প্রমথ চৌধুরীর মতো স্বচ্ছ মননশক্তি ও বিদগ্ধ বাকচাতুর্য সচরাচর দেখা যায় না। তিনি বাংলা সাহিত্যে যুগ-প্রবর্তনের চেষ্টা করছেন এবং সার্থক বলে স্বীকৃতি লাভও করেছেন — সরলা দেবীর কাছে এ কথা শুনে প্রসন্ন হয়েছিলেন গান্ধীজী। গান্ধীজী বলেন, "রবীন্দ্রনাথ কবি এবং সাহিত্যিক হয়েও জাতীয় আন্দোলনে নানাভাবে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশে স্বরাজ আন্দোলন সৃষ্টির কাজে সাহিত্যিকদের সহায়তা পাবার ভরসা তিনি রাখেন; চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে সুযোগ মতো তিনি যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করবেন, এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন।"[৭]

> সরলা দেবী বললেন, নব্যন্যায়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক মননশক্তি নিয়ে প্রমথ চৌধুরী উত্তেজনা-প্রধান রাজনৈতিক আন্দোলনকে তীব্র শ্লেষ করে থাকেন। তাঁর কাছে কালচার এবং মননশক্তির মূল্যই সবচেয়ে বেশি। জনসাধারণের অন্নবস্ত্রের সমস্যা অস্বীকার না করলেও সেটাকেই তিনি সমাজ জীবনের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বলে মানতে রাজি নন। কাজেই স্বরাজ আন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা তো দূরের কথা, লেখনির সাহায্য কতটা পাওয়া যাবে সে বিষয়েও সন্দেহ আছে বলেই জানালেন সরলা দেবী। তাতে গান্ধীজী হেসে প্রশ্ন করলেন, 'অস্পৃশ্যতা, অশিক্ষা প্রভৃতি সমাজের যেসব গ্লানি আছে সেগুলির বিরুদ্ধে কলম ধরতেও কি তিনি নারাজ?'
>
> উত্তরে সরলা দেবী বললেন, 'সেগুলির বিরুদ্ধে তাঁর কলম চলছেই, তবে তা কলম নয়, ছুরির মতো ধারালো। প্রতিটি শব্দ প্রতিটি বাক্য কেটে কেটে বসে।'
>
> 'তাতেই আমার কাজের সহায়তা হচ্ছে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ হচ্ছে', বললেন গান্ধীজী। 'সবাইকে একভাবে দেশসেবা করতে হবে এমন গোঁড়ামি আমার নেই।[৮]

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় আরো জানিয়েছেন যে সরলা দেবীর অনুরোধ ও আমন্ত্রণ সত্ত্বেও চৌধুরী মহাশয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগ দেন নি, গান্ধীজীর সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয় নি। কিন্তু কংগ্রেস ও গান্ধীজী সম্বন্ধে অপরিসীম আগ্রহে তিনি সরলা দেবীকে ডেকে কংগ্রেসের গল্প শুনেছেন এবং সেই রিপোর্ট তিনি "গত কংগ্রেস", শিরোনামে *সবুজপত্র*-য় (আশ্বিন ১৩২৭) বীরবলের জবানিতে প্রকাশ করেছেন। ঐ অধিবেশন সম্বন্ধে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন :

> বিস্তৃত, গম্ভীর ও তুমুল বিতর্কের পর অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাব উত্থাপন করে গান্ধীজী যে বক্তৃতা করেছিলেন, এমন মনে প্রাণে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করা বক্তৃতা আর কখনো শোনেন নি, মহা উচ্ছ্বাসে এই কথা ঘোষণা করলেন সরলা দেবী। বললেন, লোককে উত্তেজিত করার চেষ্টা নেই, বক্তার বাকচাতুরি নেই, নেই সুরের ওঠানামা, হাত নাড়া, কিম্বা দেহ সঞ্চালন। অনায়াস গতিতে প্রাণের ভিতর থেকে কথা বেরিয়ে আসছে। সেই নিরাভরণ বাকস্রোতে সমস্ত প্রগলভতা ধুয়ে মুছে শুচি-শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে — বক্তা, শ্রোতা ও সকলের অন্তর!

বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর যে জয়ধ্বনি উঠল সমগ্র ভারতের মাটি কাঁপিয়ে, তার রেশ সাত সমুদ্রের ওপারে গিয়ে পৌঁছায় নি এমন কথা জোর করে বলা যায় না।[৯]

গান্ধী প্রসঙ্গ : প্রমথ চৌধুরীর চিঠিতে

মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর রাজনীতি সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর সত্যকার মনোভাব বা ব্যক্তিগত অভিমত কী ছিল তা জানার একটি বিশ্বস্ত সূত্র হচ্ছে তাঁর চিঠিপত্র। কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক :

প্রমথ চৌধুরীর ধারণা ছিল যে কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনে দেশের বোকামিতে গান্ধী Non-co-operation রিজোলিউসান পাস করিয়ে নিয়েছিলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে তিনি একটি চিঠিতে (২৮.৯.১৯২০) কংগ্রেসের ভেতরের খবর দিয়েছেন :

এবারকার কংগ্রেস [সেপ্টেম্বর ১৯২০] Indian National নয়, Pan-Islamic। শুধু দেশের বোকামিতে মহাত্মা গান্ধী সেটিকে চালিয়েছেন। শুনে অবাক হবে যে মহাত্মা গান্ধীর দিকে যাঁরা ভোট করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শতকরা সত্তরজন নিরক্ষর। বড়বাজার থেকে ভাটিয়া ও বানিয়া কংগ্রেসওয়ালা ও Taxi Motor Company থেকে পাঞ্জাবী কংগ্রেসওয়ালা সংগ্রহ করা হয়েছিল। কংগ্রেসের delegation টিকিট থিয়েটারের টিকিটের মতো বিক্রি করা হয়েছিল। একজন মাড়োয়ারীকে ৪০০ খানা আর একজন খিলাফতিকে ৪০০ খানা টিকিট কংগ্রেস কর্তারা এই কলকাতা শহরে বেচেছেন। এই শ্রেণীর ডেলিগেটদের ভোটেই গান্ধী মহাত্মা তাঁর resolution পাস করিয়ে নিয়ে গেলেন। আমরা বাঙালিরা প্রায় সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দিই। তবু কাগজে দেখবে যে বাঙলার ভোট গান্ধীর বিরুদ্ধে ছিল ৩৯৪ এবং তাঁর পক্ষে ৫৫১ — এই ৫৫১[র] প্রায় পাঁচশ ছিলেন হয় ফেজ নয় পগ্গধারী। জনকতক বাঙালিও অবশ্য ঐ মেড়োর দলে গিয়ে জুটেছিলেন যথা জীতেন্দ্রলাল ব্যানার্জী। ...

কিন্তু এর চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যে যেমনি গান্ধীর প্রস্তাব ঠিকেগাড়ী ও মোটরগাড়ীর গাড়োয়ান ও বড়বাজারের ফেরিওয়ালাদের ভোটে পাস হয়ে গেল, অমনি যে বাঙালিরা কংগ্রেসের Resolution-এর বিরুদ্ধে ভোট করেছিলেন তাদের মধ্যেই আবার অধিকাংশ বেঁকে দাঁড়ালেন। তাদের বুলি হচ্ছে কংগ্রেসের resolution আইনের মতো মান্য। ...সত্য কথা বলতে হলে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসিক অবস্থা ঐ মোটরচালকদের চেয়ে বড় বেশি উন্নত মনে হয় না। যা হোক একটা মতিস্থির করে কোনো কাজ করতে এঁরা অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমান অপারগ। ...যা প্রলাপ দেশের লোক বকছে তা অনির্বচনীয়। ... যে কথার ভিতর বুদ্ধি আছে বিবেচনা আছে সে কথা বলা এখন নিষিদ্ধ। সত্য কথা বলা এখন মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে sedition বলে গণ্য।[১০]

অন্য আর একটি চিঠিতে (৫.৫.১৯২১) প্রমথ চৌধুরী সুনীতিকে লিখছেন :

এই non-violent non-co-operation-এর ফলে দেশের মন যে জ্ঞানের বন্ধন, লজিকের বন্ধন থেকে কতদূর মুক্তিলাভ করেছে তা এখানে থাকলে বুঝতে পারতে। আমরা পড়েছি একটু মুস্কিলে কেননা আমরা সরস্বতীর হাত থেকে বীণা কেড়ে নিয়ে তাঁর হাতে "চরকা" দিতে প্রস্তুত নই।[১১]

অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীর বয়কট নীতির তীব্র বিরোধী ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (পণ্ডিচেরি)-কে একটি চিঠিতে (২.২.১৯২১) রসিকতা করে চৌধুরী মহাশয় লিখেছেন :

মহাত্মা গান্ধী রেল-ট্রাম প্রভৃতি বিশ্বামিত্রের সৃষ্টিগুলোকে বর্জন করতে আমাদের পরামর্শ দিচ্ছেন। এর বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলবার নেই কেননা মহাত্মার আদেশ বিচারযোগ্য নয়, শুধু প্রচারযোগ্য। ...

তোমার চিঠি পড়ে বুঝতে পারছি যে তুমি চরকার মাহাত্ম্য তেমন হৃদয়ঙ্গম করতে পারো নি। ... মহাত্মা গান্ধী হচ্ছেন জাতিতে বণিক। অতএব piece goods তৈরি করবার দিকে তাঁর প্রবৃত্তি নৈসর্গিক। এই চরকা কাটার ফলাফল যে কী হবে তা তুমিও বলতে পার না আমিও বলতে পারিনে,

যে কথা শুনে তোমার আমার হাসি পায় সে কথা যে হাজার হাজার লোকে দৈববাণী বলে গ্রাহ্য করছে এ একটা মস্ত tragic fact।[১২]

অপর একটি চিঠিতে (১৬.৮.১৯২১) সুরেশ চক্রবর্তীকে প্রমথ চৌধুরী মনে করিয়ে দেন 'স্বদেশী'র সঙ্গে 'স্বরাজী'র প্রভেদটা ঠিক কোথায়। তাঁর মতে :

প্রভেদটা অতি স্পষ্ট। "স্বদেশীর যুগে" বাঙলার মনে ভাবের বাণ আপনা হতেই ডেকেছিল আর "স্বরাজের যুগে" একজন পলিটিকাল "ভগীরথ" [গান্ধী] সেই ভাবের গঙ্গা ডেকে আনতে চাচ্ছেন যাতে নাইলে আমাদের সকল পাপ এক মুহূর্তে ধুয়ে যাবে। শাস্ত্রের ভাষায় বলতে গেলে স্বদেশীর জীবনবেদ ছিল অপৌরুষেয় আর স্বরাজীর পৌরুষেয়।[১৩]

অবশ্য মহাত্মা গান্ধীর মূল্যায়ন করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটি তিনি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথকে (১৪.৬.১৯৩০)। ঐ চিঠির কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

আপনি জানেন যে আমি কস্মিনকালেও মহাত্মা গান্ধীর চেলা হতে পারি নি। কিন্তু আজ আমি একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে আজকের দিনে মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা হয়ে দাঁড়িয়েছেন, যদিচ আমার কাছে ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত লাগে। কোনো বিষয়ে একাগ্র হতে পারলে মানুষ যে কি শক্তি লাভ করে মহাত্মা গান্ধী তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। সুতরাং তিনি যতদিন অটল থাকবেন, দেশের লোকও ততদিন তাঁর অনুচর থাকবে।[১৪]

অসহযোগ আন্দোলন : বাঙলার অবস্থান ও গান্ধীর গুরুত্ব

গান্ধীজীর প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে প্রমথ চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন নি অনেকগুলি কারণে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন : গান্ধীর প্রস্তাবে যে আমরা [বাঙালিরা] মোহপ্রাপ্ত হই নি, তার কারণ ওর ভিতর নূতনত্বের মোহ নেই। ভাবের নেশায় পাগল হতে বাঙালি জানে ও চায়ও। ... আমরা চিরজীবন শুধু লাভ-লোকসানের হিসেব-কিতেব নিয়ে থাকতে পারিনে, আমরা আর যা হই, মাড়োয়ারি নই। ... আমাদের সেই পুরানো ভাব [স্বদেশীভাব] যদি নূতন রূপ ধরে আসত তা হলেই হয়ত আমাদের ক্ষণিকের জন্যও ভোলাতে পারত। কিন্তু এসেছে শুধু নতুন নাম ধরে। যা ছিল 'স্বদেশী', তা-ই হয়েছে 'Non-co-operation'। ভাষান্তরে অবশ্য তার যথেষ্ট রূপান্তর ঘটেছে কিন্তু সে তার বিরূপতার দিকে। ...এই Non-co-operation-এর ভিতর যদি কিছু থাকে ত ছেরেপ পলিটিক্স — আর তার ভিতর যা আদপেই নেই তা হচ্ছে 'Idealism'। ... বাঙলার স্বদেশীয়তার গায়ে রূপ ছিল রঙ ছিল, তার অন্তরে কল্পনা ছিল কবিত্ব ছিল, আমাদের স্বদেশী মনের ভিতর একমাত্র পলিটিক্স বিদ্বেষের তীব্রতা ছিল না, সেই সঙ্গে ছিল একটা আনন্দ-ব্যাকুলতা।[১৫]

প্রমথ চৌধুরীর মতে, স্বদেশী ব্যাপারটা বাঙালিদের কাছে ছিল যেমন স্বাভাবিক, Non-co-operation বস্তুটা তেমনি কৃত্রিম। কংগ্রেসের রিজলিউসন পাস করে, তার প্রভাবে দেশের লোকের মন গড়ে তোলবার চেষ্টা তাঁরাই করতে পারেন যাঁরা মানুষের মন কী বস্তু জানেন না, ...বাইরের চাপে এই materialistic প্রচেষ্টার ফলে

যা জন্মলাভ করে তার নাম হুজুগ অর্থাৎ তাতে লোকের মনে ক্ষণিক চাঞ্চল্য এনে দিতে পারে কিন্তু তার কোনো স্থায়ী পরিবর্তন ঘটাতে পারে না।

গান্ধীর 'অসহযোগ'-এর সঙ্গো 'খিলাফৎ' আন্দোলনকে যুক্ত করার নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। ও দুটি আন্দোলনকে মেলানো যায় না, এক গোঁজামিলন দেওয়া ছাড়া। এই দুটি আন্দোলনের জন্ম হচ্ছে পৃথক মনোভাব থেকে। খিলাফতের মূলে আছে সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মবুদ্ধি আর অসহযোগের মূলে আছে সমগ্র ভারতবাসীর পলিটিক্যাল বুদ্ধি। অর্থাৎ অসহযোগের মূলে আছে স্বদেশ-বাৎসল্য। আর খিলাফতের মূলে আছে স্বজাতি-বাৎসল্য। Indian nationalism-এর স্বদেশ-বাৎসল্য হচ্ছে বর্ণধর্ম নির্বিচারে স্বদেশী বাৎসল্য, আর Pan-Islamism-এর স্বজাতি-বাৎসল্য হচ্ছে স্বদেশী বিদেশী নির্বিচারে স্বধর্মী-বাৎসল্য। জাতীয়তার দিক থেকে দেখতে গেলে, এ দুয়ের পার্থক্য এতই স্পষ্ট যে, কাউকে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় না। তবে তিনি বিশ্বাস করেন না যে কংগ্রেস ও খিলাফতের এই মিলনটার ভিতর সহৃদয়তা আদপেই নেই। ভারতবর্ষের মুসলমানের পক্ষে ন্যাসনালিস্ট হওয়ার কোনো বাধা নেই, কেননা পলিটিক্যাল হিসেবে হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এক। অপর দিকে, হিন্দুদের পক্ষে খিলাফৎ বিষয়ে মুসলমানের ব্যথার ব্যথী হওয়ায়ও স্বাভাবিক, কেননা উভয়ের মধ্যে একমাত্র স্বার্থের নয়, সমবেদনারও বন্ধন আছে। অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরীর মূল বক্তব্য এই যে, পলিটিক্সের সঙ্গো ধর্ম জড়িয়ে গেলে পলিটিক্যাল সমস্যার পলিটিক্যাল মীমাংসা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই তাঁর সাবধান বাণী হলো : পলিটিক্সের সঙ্গো ধর্মের যোগ করাটা পৃথিবীর সকল দেশেই বিপজ্জনক এবং ভারতের মতো এই নানা ধর্মের দেশে বিশেষ আশঙ্কার কথা।

গান্ধীর কথা অনুসারে, স্বরাজ্য লাভই হচ্ছে Non-co-operation-এর মুখ্য উদ্দেশ্য। পাঞ্জাবের [জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড] ও তুর্কীর প্রতি ইংরেজের ব্যবহার ভারতীয়দের শুধু এই বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে মাত্র। প্রমথ চৌধুরীর জিজ্ঞাস্য : উক্ত ঘটনাদ্বয় যদি না ঘটত তাহলে কি পূর্ণ স্বরাজের দাবি করাটা ভারতীয়দের পক্ষে হয় অন্যায় নয় অনাবশ্যক হতো? তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, দু'শ-চারশ উপাধিধারীর উপাধি ত্যাগ, পাঁচ-সাত হাজার উকিলের ওকালতি ত্যাগ এবং লাখ-দেড় লাখ ছেলের স্কুল-কলেজ ত্যাগের ফলে এদেশ থেকে ইংরাজ বণিকও চলে যাবে না, ইংরাজ সৈনিকও চলে যাবে না। অতএব Non-co-operation-এর প্রসাদে কী রকম স্বরাজ যে লাভ হবে তা তাঁর কল্পনার অতীত। মহাত্মা গান্ধী যে স্বরাজের লোভ দেখাচ্ছেন তাতে যে বাঙলার মানুষ বিশেষ প্রলোভিত হচ্ছে না তার কারণ সে স্বরাজের স্বরূপ বাঙালিদের বুদ্ধির অগম্য। এক কথায়, Non-co-operation-এর প্রস্তাব গ্রাহ্য করার পক্ষে বাঙালিদের প্রধান বাধা intellectual বাধা। যার intellectual-এর বালাই নেই তার পক্ষে উক্ত প্রস্তাব শিরোধার্য করা যত সহজ বাঙালির পক্ষে তত সহজ নয়। তা সত্ত্বেও অসহযোগ আন্দোলনের একটি ইতিবাচক দিক প্রমথ চৌধুরীর চোখ এড়িয়ে যায় নি। মহাত্মা গান্ধী যা হোক এমন একটি প্রস্তাব তুলেছেন যা মেনে নিতে হলে দেশের লোককে কিছু করতে হবে, আর কিছু না হোক কিঞ্চিৎ ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ করতে হবে। মহাত্মা গান্ধী আর কিছু না করুন, দেশের লোককে এই সত্যটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, যাঁরা স্বরাজের জন্য চিৎকার করছেন, তাঁদের তা লাভের জন্য কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করতেই হবে। ভারতবর্ষের পলিটিক্স যে কত শূন্যগর্ভ, অর্থাৎ — ভারতের নেতাদের বড় কথার পিছনে যে বড় বড় মন, বড় বড় চরিত্র নেই, এই সত্যটি গান্ধীজী দেশের লোককে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।[১৬]

গান্ধীর বিচার ও গান্ধী মাহাত্ম্য

আগেই বলেছি, গান্ধীজীর নন-কো-অপারেশন সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর তীব্র বিরূপ মনোভাব ছিল। তা সত্ত্বেও চৌরিচোরার ঘটনার পর ১৯২২-এর ১৮ই মার্চে গান্ধীর বিচারের সময় আদালতে তাঁর বিবৃতি শুনে প্রমথ চৌধুরী অভিভূত হন এবং তাঁর বক্তব্য *মাসিক বসুমতী*-তে "আমাদের মতবিরোধ" নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। শিক্ষিত বাঙালি নব্য যুবকদের কাছে এটি একটি অভাবনীয় ঘটনা। এ প্রসঙ্গে হীরেন মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথা *তরী হতে তীর*-এ লিখেছেন :

অনেক বেশি চাঞ্চল্য দেখেছিলাম বসুমতী অফিসে যেদিন প্রথিতযশা প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) গান্ধীজীর বিচার সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠালেন — যিনি ছিলেন মহাত্মার চিন্তা ও কর্মের কঠোর সমালোচক, তিনিই বিচারকালে প্রদত্ত গান্ধী-বিবৃতিতে মুগ্ধ হয়ে বললেন এমন "স্থিতপ্রজ্ঞ" ও সাহসী মানুষের সন্ধান কখনো তো মেলে নি।[১৭]

"আমাদের মতবিরোধ"-এ প্রমথ চৌধুরী প্রথমেই স্বীকার করে নেন যে তাঁদের মতের অমিল সত্ত্বেও বিচারের পর মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সবাই একমত। একথা যে অন্তত তাঁর মুখে শুধু কথার কথা নয় — তা-ই প্রমাণ করবার জন্য গান্ধীর মাহাত্ম্য যে কোথায় তা পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করেন তিনি।

তাঁর প্রথম কথা, মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রবল অসাধারণ। এই চরিত্র কথাটা নানা লোকে নানা অর্থে বোঝে। ইংরাজিতে যাকে বলে asceticism, তার প্রতি প্রমথ চৌধুরীর একটা সহজ শ্রদ্ধা ছিল। কাষায় বসনকে তিনি দেখামাত্র উচ্চ আসন দেন। কিন্তু তাই বলে যিনি শারীরিক ক্লেশ সম্বন্ধে উদাসীন, আর যিনি শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বর্জন করেছেন, তাঁকেই তিনি 'মহাপুরুষ' বলতে প্রস্তুত নন। আসলে মাহাত্ম্য আত্মার ধর্ম, দেহের নয়; সুতরাং তাঁর কাছে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে উপবাসাদির বিশেষ কোনো সম্বন্ধ নেই। মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে তিনি এই কটি অসাধারণ গুণ দেখতে পান — মহাত্মা গান্ধী সম্পূর্ণ নির্ভীক, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, কথায় এবং কাজে তিনি সম্পূর্ণ অকপট এবং সম্পূর্ণ সংযত। নন-কো-অপারেশন ব্যাপারের প্রধান বল হচ্ছে মহাত্মার চরিত্রবল। ঐ প্রোগ্রাম যদি অপর কেউ, যথা ভি. জে. প্যাটেল সৃষ্টি করতেন, তাহলে তার জন্ম-মৃত্যু যে একই তারিখে হতো, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। বিপিন পাল একবার বিদ্রূপ করে বলেছিলেন যে, তিনি 'লজিক' বোঝেন, 'ম্যাজিক' বোঝেন না। লৌকিক মনের উপর মহাত্মা গান্ধীর যে অলৌকিক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে, তাকে ঐন্দ্রজালিক বললে অত্যুক্তি হয় না এবং একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে, এ ম্যাজিক হচ্ছে মহাত্মার চরিত্রবলের মন্ত্রশক্তি।

মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতার ভাষাও তাঁর চরিত্রের বা মনের বিশেষ গুণ। প্রমথ চৌধুরীর জবানিতেই শুনুন :

মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতার ভাষা যে কতদূর স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন সকলে তা লক্ষ করেছেন কিনা জানি নে। এ ভাষায় কোনো আড়ম্বর নেই, কোনো অলঙ্কার নেই, কোনো বাহুল্য নেই, কোনো অত্যুক্তি নেই; তাঁর এ ভাষা যেমন সংযত, তেমনি শক্তিশালী। এর কারণ, ভাষায় তিনি তাঁর মনের নগ্নরূপ লোকের চোখের সুমুখে ধরে দেন। তাঁর ভাষার শক্তি ও রূপের পিছনে আছে তাঁর চরিত্র। সম্পূর্ণ অকপট হতে পারলে মানুষের ভাষা যে কী অসাধারণ প্রসাদগুণ লাভ করে, তার পরিচয় মহাত্মা গান্ধীর ভাষা, যদিচ সে ভাষা তাঁর মাতৃভাষা নয়, একটি বিদেশী ভাষা। ...আমরা যাকে স্টাইল বলি, সেটা যে মনের গুণ, ভাষার গুণ নয়, মহাত্মা গান্ধীর ভাষা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[১৮]

মহাত্মা গান্ধীর নির্ভীকতা ও পরার্থপরতা সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর মনে কখনও তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। তবে গান্ধীর মুখের কথা যে পুরোপুরি তাঁর মনের কথা — এ বিশ্বাস প্রমথ চৌধুরীর বরাবর ছিল না। তাঁর মনে এ সন্দেহ পূর্বে হয়েছে যে, হয়ত গান্ধীজী তাঁর মনের কথা সম্পূর্ণ খুলে বলেন নি। রাজনীতির সঙ্গে কূটনীতির যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, ও-নীতিতে উদ্দেশ্য যে তার উপায়কে পূত করে, আবহমান কালের ইতিহাস তার প্রমাণ দেয়। অতএব পলিটিসিয়ানদের কথা যে সম্পূর্ণ সরল, সে বিষয়ে সন্দেহ মানুষের মনে সহজেই জন্মে। তারপরেই প্রমথ চৌধুরী স্বীকার করেন :

> আদালতে তাঁর বিচারের সময়, তাঁর কথা ও তাঁর ব্যবহার আমার মন থেকে চিরদিনের জন্য এ সন্দেহ দূর করেছে। তাঁর কথা যে সম্পূর্ণ অকপট, ঐ বিচার ক্ষেত্রেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে। যেমন কোন কবির প্রতিভা, তাঁর রচিত নানা কাব্যের ভিতর কোনো একখানি বিশেষ কাব্যে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তেমনি উক্ত বিচারস্থলেই মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রের সৌন্দর্য ও শক্তি সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয়েছে।
>
> নির্ভীকতায়, সরলতায়, সংযমে ও সৌজন্যে ও-ক্ষেত্রে তাঁর আত্মোক্তি — আমার কাছে একটি work of art স্বরূপে গণ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটি মহাপুরুষের, সক্রেটিসের, বিচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, আর সে বিবরণ আজ তিন হাজার বৎসর ধরে মানুষের মনকে মুগ্ধ ও পরিতুষ্ট করে আসছে। মহাত্মা গান্ধীর বিচারের বিবরণ পড়ে আমার ঐ সক্রেটিসের বিচারের কথাই মনে পড়ে। যে সকল গুণের সদ্ভাবে সক্রেটিসের আত্মোক্তি সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে, প্রায় সে সকল গুণেরই সাক্ষাৎ মহাত্মা গান্ধীর আত্মোক্তিতে পাওয়া যায়।[১৯]

প্রমথ চৌধুরীর এর পরের বক্তব্য হলো : বর্তমানে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে মানুষের মহত্ত্ব — 'কে কী করে' তাই দিয়ে বিচার করা হয়; 'কে কী' — সে বিষয়ে ততটা মন দেওয়া হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতায় মনুষ্যত্বের মাপকাঠি ছিল স্বতন্ত্র। আজকাল আত্মচেষ্টার লক্ষ্য হচ্ছে "to do", আর সেকালে ছিল "to be"। তারপর গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করে প্রমথ চৌধুরী মন্তব্য করেন : "যে প্রতিষ্ঠিত পুরুষের আদর্শ আমরা এতদিন শুধু সংস্কৃত পুস্তকেই পড়ে আসছি, মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে সেই আদর্শের যতটা সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে, অপর কারও চরিত্রে তা পাওয়া যায় নি। যাঁর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, তাঁর যে কোনো কর্ম নেই, তা নয়, কিন্তু তাঁর কর্মের প্রেরণা ও পদ্ধতি আমাদের কর্মের প্রেরণা ও পদ্ধতি নয়।"[২০]

প্রমথ চৌধুরীর শেষ কথা এই যে, তিনি এমন অনেক লোক দেখেছেন যাঁরা মনে করেন যে, উক্ত প্রোগ্রাম [নন-কো-অপারেশন] রচনা করেছেন বলেই গান্ধী একজন মহাত্মা। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর মত ঠিক উল্টো : মহাত্মা গান্ধীর প্রোগ্রাম বলেই জনসাধারণের কাছে তার এত মাহাত্ম্য। মহাত্মা গান্ধী যদি এর ঠিক উল্টো প্রোগ্রাম বার করতেন, অর্থাৎ non-violence-এর বদলে তিনি যদি violence প্রচার করতেন, তাহলে জনসাধারণ তা প্রত্যাখ্যান করত, এমন কথা যদি কেউ মনে করেন, তাহলে তিনি ভুল ভেবেছেন। রাজনৈতিক মতভেদের প্রকাশ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ সবার চোখের সুমুখে রাখা উচিত কেননা তাতে ভারতবাসী ভয়ে মিথ্যা কথা বলতে ঈষৎ সঙ্কুচিত হবে এবং কথায় অসংযম ও অসৌজন্য দেখাতে লজ্জিত হবে।[২১]

মহাত্মার প্রায়োপবেশন (১৯২৪)

মহাত্মা গান্ধী ১৯২৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে হিন্দু-মুসলমান সংহতির জন্য ২১ দিনের প্রায়োপবেশন করেন। ঐ ঘটনায় প্রমথ চৌধুরী গান্ধীর মহত্ত্ব আরও গভীর ভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি বলছেন :

> মহাত্মা গান্ধী যখন চার বৎসর [১৯২০] পূর্বে এদেশে প্রথমে স্ব-রূপে আবির্ভূত হন, তখন আমরা কোনো শিক্ষিত লোকই তাঁকে ঠিক চিনতে পারি নি। আমরা নন-কো-অপারেটর হই আর অ-নন-কো-অপারেটর হই, আমরা কেউউ অন্তরের সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবিত ভারত উদ্ধারের উপায়গুলি গ্রাহ্য করতে পারি নি। আমি যে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করি নি তার কারণ — আমার জ্ঞান বুদ্ধিতে যতদূর কুলোয়, তাতে আমি তাঁর প্রচারিত পলিটিক্স ও ইকনমিক্সকে, পলিটিক্স ও ইকনমিক্স বলে স্বীকার করতে পারি নি। চরকার গুণ ব্যাখ্যান করতে বললে — আমি আগাগোড়া মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য হতুম। কিন্তু কারও কপট শিষ্য হওয়া আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ...অপরপক্ষে তাঁর যে সকল শিষ্য তাঁকে মহা Politician এবং মহা Economist বলে বিশ্বাস করতেন — তাঁরাও ঠিক চিনতে পারেন নি। মহাপুরুষ কখনও মহাচালাক হয় না।
>
> এ সত্ত্বেও জনগণের মনের উপর তাঁর মনের অসামান্য প্রভাব দেখে আমার মনে এ সন্দেহ বরাবরই ছিল যে, আমাদের শিক্ষাই হয়ত তাঁকে যথার্থ চেনবার পক্ষে আমাদের মনের প্রধান বাধা হয়েছে।[২২]

মহাত্মা গান্ধী উপবাস ব্রত গ্রহণ করেছেন এ কথা শুনে আপামর সাধারণ সকলেই আশঙ্কিত ও ব্যথিত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি সমগ্র ভারতবাসীর এই অসাম্যন্য প্রীতি বাস্তবিকই একটি অলৌকিক ঘটনা। এই অলৌকিকতার কারণ ব্যাখ্যা করে প্রমথ চৌধুরী বলেন :

> আমাদের মনের যে-অংশ rational সে অংশের উপর মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব তাদৃশ না থাকলেও আমাদের মনের যে-অংশ spiritual সে অংশের সঙ্গে তাঁর মনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। ....মহাত্মা গান্ধী একজন পলিটিসিয়ান না হতে পারেন, ইকনমিস্ট না হতে পারেন কিন্তু তার চাইতে তিনি ঢের বড়। তিনি হচ্ছেন মানুষ ও ভারতবর্ষে এ যুগে একমাত্র মানুষ।
>
> মহাত্মা আজ কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন? তিনি প্রায়শ্চিত্ত করছেন শিক্ষিত সমাজের কপটতা ও জনগণের হিংস্রতার জন্য। তিনি এ সত্য স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি যে, যে-অন্ধশক্তির তাণ্ডবলীলা আমাদের সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে, সে অন্ধশক্তি উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি নিজে দায়ী। আমরা যেমন তাঁকে চিনতে পারিনি, তিনিও তেমনি আমাদের চিনতে পারেননি। ভারতবর্ষের লোক রাগ-দ্বেষের যে বহির্ভূত নয় এ সত্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন। সে যাই হোক, ভারতবাসী বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে তাঁকে বুঝতে না পারুক, নিজের অন্তর দিয়ে যে তাঁকে চিনতে পেরেছে, এ আমি দেশের অতি সৌভাগ্যের কথা বলে মনে করি।[২৩]

মহাত্মার কারামুক্তি

মহাত্মা গান্ধীর জেল থেকে মুক্তির (৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪) ঘটনায় প্রমথ চৌধুরী নিজের চোখে দেখেছেন যে ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। এর কারণ অনুসন্ধান করে তিনি এই কথা জানতে পারেন যে অনেকের বিশ্বাস — এদেশের লোকের মনে মহাত্মা গান্ধী যে পরিমাণ national consciousness জাগিয়ে তুলেছেন অপর কেউ তার শতাংশের একাংশ করতে কৃতকার্য হন নি। প্রমথ চৌধুরী অকপটে স্বীকার করেন : একথা ঠিক। তার সঙ্গে এও যোগ করেন :

তিনি [গান্ধী] শুধু national consciousness নয় সেই সঙ্গে national conscience জাগাতে ব্রতী হয়েছেন এবং তাতে যে কৃতকার্য হয়েছেন তার কারণ জনগণকে একদিনে political minded করে তোলা যায় না কিন্তু political করে তোলা যায়। এ দুই যে এক জিনিস নয়, তার প্রমাণ মানুষ পেট্রিয়ট হয়েও পলিটিসিয়ান না হতে পারে, আবার পলিটিক্সের জন্য চাই শিক্ষা আর পেট্রিয়টিজমের জন্য চাই শুধু দীক্ষা। ...একমাত্র সেই লোক অপরের conscience উদ্বুদ্ধ করতে পারে যার নিজের conscience নামক জিনিসটি আছে আর বহু লোকের conscience সেই জাগাতে পারে যার নিজের অন্তরে national conscience জাগ্রত। মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের শুধু জাতীয় অহংজ্ঞান জাগ্রত করতে চেষ্টা করেন নি। সেই সঙ্গে প্রতি লোকের আত্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন।[২৪]

মহাত্মার প্রায়শ্চিত্ত (১৯৩২)

গান্ধী সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর আরও সুচিন্তিত মতামত পাওয়া যায় ১৯৩২-এ গান্ধী যখন [২০-২৬ সেপ্টেম্বর] অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে উপবাসব্রত গ্রহণ করেন। প্রমথ চৌধুরী দেখেন যে মহাত্মার প্রায়োপবেশন সংকল্প হিন্দু সমাজকে অতিমাত্রায় বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। এর কারণ এই যে মহাত্মার এ সংকল্প মিথ্যা সংকল্প নয়। তিনি যে এই অনশন ব্রত আমরণ প্রতিপালন করবেন সে কথা সকলেই জানে। তাঁর কথা শুধু মুখের কথা নয়। গান্ধীজীর কথায় আর কাজে যে কোনো প্রভেদ নেই তার প্রমাণ তিনি আজীবন দিয়েছেন এবং সেই কারণেই তাঁর কথা দেশের লোকের মনের উপর এতটা প্রভুত্ব করে। মহাত্মার বাণী যে বহু লোকের মর্ম স্পর্শ করেছে এই প্রত্যক্ষ সত্য সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী অন্ধ ছিলেন না। তাই মুগ্ধতার সঙ্গে তিনি লেখেন :

মহাত্মা যে-বাণী প্রচার করেছেন তা বহু দেশবাসীর মনকে আত্যন্তিকভাবে মুগ্ধ করেছে — তার প্রধান কারণ মহাত্মাজীর অসামান্য sincerity। এ জাতীয় বাণীর economic সার্থকতা যাই হোক না কেন তার psychological শক্তি প্রত্যক্ষ। তাঁর প্রতি কথার ভিতর যার পরিচয় পাওয়া যায়, সে হচ্ছে তাঁর মহৎ আত্মার। মহাত্মা গান্ধীর লৌকিক মনের উপর এই অলৌকিক শক্তির ইংরাজি নাম হচ্ছে moral force। এ শক্তি কোনো বাহ্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এর স্পর্শে আমাদের মনের অন্তর্নিহিত আত্মশক্তি উদ্ভাসিত, উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতা দূর করবার জন্য আজকের দিনে যে চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে তার ফলে হিন্দু-মন মনুষ্যত্বের আর এক ধাপ উপরে উঠে যাবে।[২৫]

মহাত্মা এ ব্রত গ্রহণ করেছেন ভারতবাসীদের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য। অপরের পাপ ক্ষালন করবার জন্য যিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত তাঁকে মানব সমাজ চিরকালই redeemer বলে শিরোধার্য করেছে — এই যুক্তিতে প্রমথ চৌধুরী মহাত্মাকে যীশুর সঙ্গে তুলনা করেছেন ও একই আসনে বসিয়েছেন। মহাত্মার সংকল্পে হিন্দু সমাজের দেহে ও মনে যে প্রাণের লক্ষণ ফুটে উঠেছে, কেউ কেউ তাকে হয়ত emotionalism মনে করেছেন। ব্যাপারটা যদি তাই হয় তবুও প্রমথ চৌধুরীর মতে, "যিনি সমগ্র জাতির মনে একদিনে এ বিরাট emotion-এর সৃষ্টি করতে পারেন, তাঁর আত্মশক্তি যে দৈবশক্তি একথা কোন্ বুদ্ধিমান অস্বীকার করবে?"[২৬]

আবার ১৯৩৩-এর আগস্ট মাসে [১৬-২৩ আগস্ট] অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যখন মহাত্মা গান্ধী অনশন ব্রত অবলম্বন করেন তখন *উদয়ন* পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩৪০) "ঘরে বাইরে"-র প্রথম প্রস্তাবে গান্ধী সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী যে মন্তব্য করেন সেটি মহাত্মা সম্পর্কে তাঁর সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিচার :

এ অনশনব্রত পালন করে তিনি [গান্ধী] আবার প্রমাণ করেছেন যে, তিনি দেহ ও মনে একজন অসাধারণ পুরুষ। যারা মহাত্মার শিষ্যও নয়, অনুরক্ত ভক্তও নয়, তারাও স্বীকার করতে বাধ্য যে, তাদের তুলনায় তিনি একজন superman। Superman-মাত্রই সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। মহাত্মার জনৈক সহচর [মহাদেব দেশাই?] বলেছেন যে, তিনি একজন mystery-man; এ কথা সত্য, কারণ আমরা সেই ব্যাপারকে mystery বলি, যার কার্য-কারণ আমরা আমাদের সহজ মন দিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারি নে, অথচ যার শক্তিও আমরা অস্বীকার করতে পারি নে।[২৭]

১৯৩০-এর দশকে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব যখন খর্ব হচ্ছিল তখন গান্ধীর অভাবে কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে প্রমথ চৌধুরী চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ পাঁচজনে মিলে কাউকে নেতা বানানো যায় না; লোকে নেতা হয় নিজগুণে। প্রমথ চৌধুরী স্বীকার করেন, "মহাত্মার আমি মন্ত্রশিষ্য নই এবং একদিনের জন্যেও যে হই নি তার কারণ তাঁর মন্ত্রের অর্থ আমি কস্মিনকালেও হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি — না ধর্ম সম্বন্ধে, না পলিটিক্স সম্বন্ধে, কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা অসম্ভব যে, তাঁর তুল্য চরিত্রবল আজকালকার অন্য কোনো leader-এর নেই। এই চরিত্রবল যে কত বড় শক্তি, তা মহাত্মা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।"[২৮]

টীকা

১। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দ্র. সুরজিৎ দাশগুপ্ত, পৃ. ১-২৭।
২। Sarvani Gooptu, pp. 61-76.
৩। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, পৃ. ২৩৬।
৪। প্রমথ চৌধুরী, *অলকা* (মাঘ ১৩৪৬), পৃ. ৪০০-৪০২।
৫। ঐ, পৃ. ৪০২।
৬। ঐ, পৃ. ৪০২।
৭। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ২৮৮।
৮। ঐ, পৃ. ২৮৮।
৯। ঐ, পৃ. ২৯২-২৯৩।
১০। প্রমথ চৌধুরী (১৯৯১), পৃ. ১৩।
১১। ঐ, পৃ. ১৫।
১২। সুপ্রিয় ভট্টাচার্য (২০১১), পৃ. ৭৫-৭৬।
১৩। ঐ, পৃ. ১০৬।
১৪। প্রমথ চৌধুরী (১৩৯৭), পৃ. ১৭।
১৫। মলয়েন্দু দিন্দা (২০১১), পৃ. ১১১-১১২।
১৬। ঐ, পৃ. ১১৮।
১৭। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৮৫।
১৮। মলয়েন্দু দিন্দা (২০১১), পৃ. ১৩৩-১৩৪।
১৯। ঐ, পৃ. ১৩৪।
২০। ঐ, পৃ. ১৩৫।
২১। ঐ, পৃ. ১৩৬।
২২। ঐ, পৃ. ১৩৮।
২৩। ঐ, পৃ. ১৩৯।
২৪। বীরবলের পত্র, *বিজলী*, ৮ ফাল্গুন ১৩৩০, পৃ. ২।
২৫। মলয়েন্দু দিন্দা (২০১১), পৃ. ১৪০।
২৬। ঐ, পৃ. ১৪২।
২৭। প্রমথ চৌধুরী (২০০৮), পৃ. ১২-১৩।
২৮। ঐ, পৃ. ৩৪।

রচনাপঞ্জি

(প্রকাশনা স্থান আলাদা করে উল্লেখ না থাকলে কোলকাতা বুঝতে হবে)

অতুলচন্দ্র গুপ্ত। *রচনা সংগ্রহ*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ২০১৩।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। *স্মৃতিসম্পুট*। বিশ্বভারতী, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ (২০০০)।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। *চলমান জীবন*। প্রতিক্ষণ, ২০২১ (প্রথম প্রকাশ ১৯৫২)।

প্রমথ চোধুরী। *প্রবন্ধসংগ্রহ*। বিশ্বভারতী, ২০০৩।

—। *ঘরে বাইরে*। মনফকিরা, ২০০৮ (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৬)।

—। "বীরবলের পত্র"। *বিজলী*, ৮ ফাল্গুন, ১৩৩০।

—। "বোম্বের নেতৃবৃন্দ"। *অলকা*, মাঘ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ (১৯৩৯)।

—। "পত্রাবলী : রবীন্দ্রনাথকে লিখিত"। *দেশ* (সাহিত্য সংখ্যা), ১৩৯৭।

—। "সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র", *আকাদেমি পত্রিকা*, চতুর্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৯৮ (মে ১৯৯১)।

বিজিত কুমার দত্ত (সম্পা.)। *সেরা সবুজপত্র সংগ্রহ*। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ২০০১।

মলয়েন্দু দিন্দা (সম্পা.)। প্রমথ চৌধুরী/*অগ্রন্থিত রচনা* ২। মনফকিরা, ২০১১।

—। *বীরবলের টিপ্পনী*। সহজপাঠ, ২০১৩ (প্রথম প্রকাশ ১৩২৮ বঙ্গাব্দ)।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। *বাঙলা সাহিত্যিক গদ্য*। পুনশ্চ, ২০২২।

সুপ্রিয় ভট্টাচার্য (সম্পা.)। *প্রমথ চৌধুরীর পত্রাবলী : সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (মণি)-কে*। ইণ্ডিয়ানা, ২০১১।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধি : একটি ঐতিহাসিক সম্পর্কের সূত্রপাত। *আকাদেমি পত্রিকা*। সংখ্যা ১৪, মে ২০০২, পৃ. ১-২৭।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। *তরী হতে তীর*। মনীষা, ২০২২ (প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪)।

Gooptu, Sarvani. "Gandhi and the Bengali Intellectuals : Perceptions and Portrayal of his Ideas in Contemporary Vernacular Journals in the 1920s and 1930s". *M. K. Gandhi, Media, Politics* and *Society*. Chandrika Kaul (ed.). Noida : Springer Nature (Palgrave / Macmillan), 2020.

দেওয়াল পত্রিকা

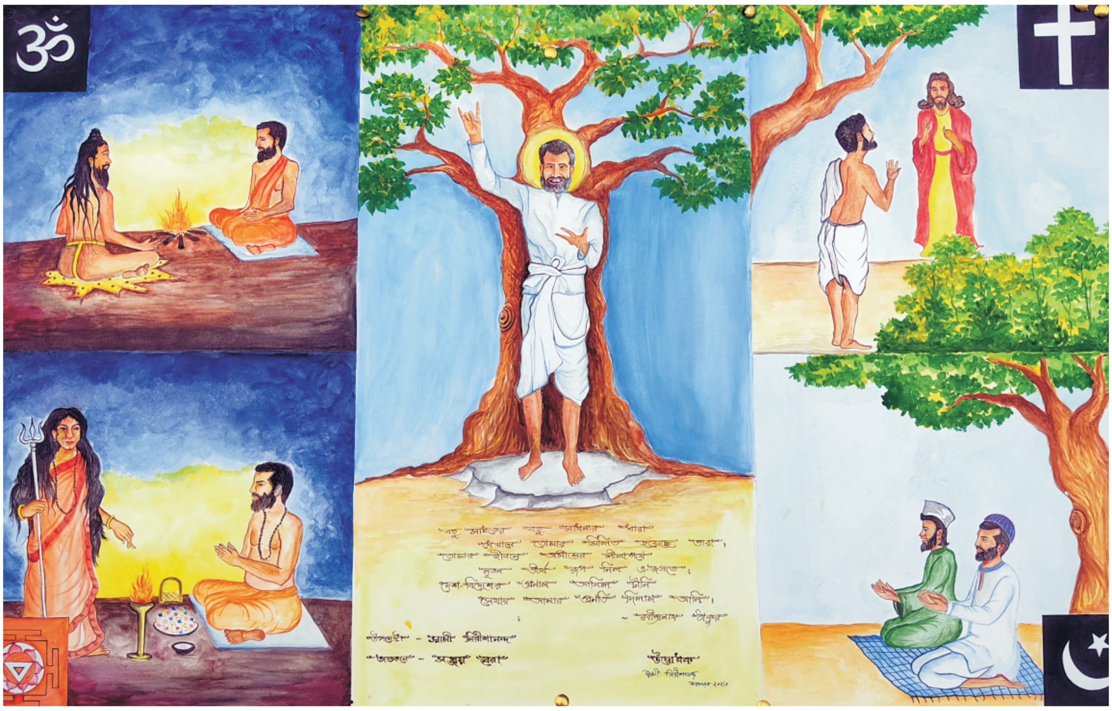

Wall Magazine

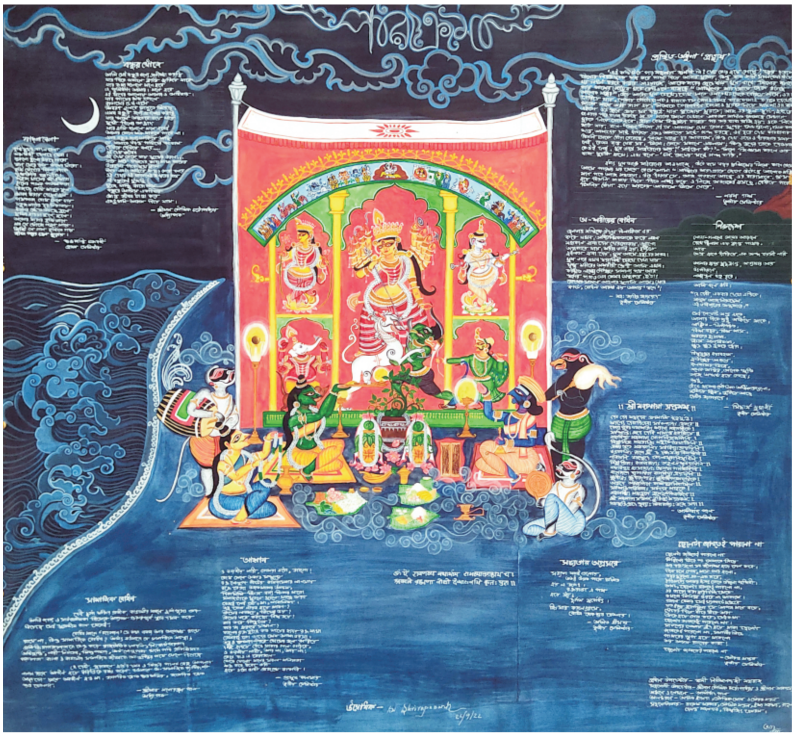

The Four Noble Truths : A Pathway to Overcoming and Understanding Suffering (by Buddha)

Akash Barua **[Student, B.Ed. 1st Year]**

Introduction :–

The Four Noble Truths were first introduced by Lord Buddha in his first sermon to the five monks at the deer park near Benaras. It is called the **"Dhammachakkapavattana – Sutta"**.

This Four Noble/Sacred Truths offer a framework for self awareness, personal growth, and liberation. Their main goal is to have full control over suffering, promoting well-being and guiding individuals towards a deeper understanding of life, leading to the Ultimate enlightenment and inner-peace.

The Prime benefits of Understanding this Four Noble Truths is –

i) Greater Self-Awareness :–

By recognizing the nature of suffering and understanding its causes, individuals gain a deeper awareness of their own thoughts, emotions, and actions. This leads to a greater insights into personal habits.

ii) Overcoming Suffering :-

Understanding that suffering is a natural part of life helps people to accept challenges and setbacks without feeling overwhelmed. This acceptance builds emotional resilience, enabling people to cope with difficulties calmly and effectively.

iii) Personal and Spiritual Development :-

The Four Noble Truths provide a foundation for ethical and moral growth, guiding individuals on a path towards wisdom and self-discipline.

iv) A sence of Inner Peace, Liberation :-

By practicing detachment from desires and reducing ignorance, one individual finds a scnse of inner peace and freedom from the cycles of craving and dissatisfaction, This state of liberation or Nirvana, leads to lasting contentment and fulfillment. By having the sense of inner-peace one can have the power of controlling their suffering or sorrow.

Understanding the Four Noble Truths :-

These Truths are in Pali, termed called 'Aryasatya'. They are so called because they are discovered by the greatest Ariya, the Buddha.

Here are those Four Noble Truths:

1) The Truth of suffering *(Dukkha)*.
2) The Truth of the cause of suffering *(Samudaya)*.
3) The Truth of the end of suffering *(Nirodha)*.
4) Providing the Eight-fold path to end the suffering *(Magga)*.

Those are the four external truths of Lord Buddha which deal with the suffering and the wheel of life and death.

Here are the brief description of those four truths.

1. The Truth of Suffering [*Dukkha*] :-

The first Truth deals with *'Dukkha'* which is 'suffering' or 'sorrow'. As a feeling *dukkha* means that which is difficult to be endured. As an abstract truth *dukkha* is used in the sense of "contemptible" *(du)* and "emptiness" *(kha)*. The world rests on suffering. And suffering defines the experiences of pain, dissatisfaction and impermance are inherent in existence. Birth, ageing, sickness and death are all forms of *dukkha* which Buddha described.

Average humen are only surface-seers. As an *Ariya* (truth hunter) sees things as they truly are. To an *ariya*, all life is suffering and he/she finds no real happiness in this world which deceives mankind with illusory pleasure. Material happiness is merely the gratification of some desire. The desire of honour, wealth, power, conquests – these are the sourse of sorrow and pain for the possessors.

Imbedded wish is also suffering. We do not wish to be associated with thing or person we hate or detest the most, nor we wish to be separated with the thing, person or moment we love the most. Our cherished desire leads us to the path of suffering. What we least expect or what we least desire are often thrust on us. And that unexpected and intolerable circumstances become painful.

According to the Buddha non-attachment *(viragata)* or non-desire to the material is a greater bliss.

2. The Second Noble Truth : The Cause of Suffering *(Samudaya)* :-

The main cause of suffering is craving for attachment *(tanha)* which is the second noble truth. Lord Buddha states that suffering arises from craving or intense desire and attachment. This craving manifests in three forms :

i) Kâma-tanhâ : Craving for sensual pleasures and physical gratification.

ii) Bhâva-tanhâ : Craving for existence or becoming, such as the desire for success, power, or eternal life.

iii) Vibhâva-tanhâ : Craving for non existence, such as a wish for self annihilation *(Nâsa)* or escape from pain.

Another root cause of suffering is to ignore the true nature of reality, such as the impermanence of all things, the non self *(anâtta)* and the inevitability of suffering *(dukkha)*.

The craving is a powerful mental force latent in all, and is the chief cause of the ills of life. Therefore, the Second Noble Truth encourages self-reflection to identify and understand these cravings.

3. The Third Noble Truth : The End of Suffering *(NIRODHA)* :-

The third Nobel truth by the Gautama Buddha is the *Nirodha*, or the end of suffering. It can only be achieved by eradication of all forms of craving. It means that it is possible to overcome and extinguish suffering by eliminating it's causes-craving *(tanha)* and attachment.

There are some key points of the third noble truth.

i) End of Suffering : Suffering *(dukkha)* can only cease entirely when the mind is totally free from desires and attachments. And after redemption one can achieve *nirvana* (In Pali, *Nibbana*). *Nirvana* is the state where we can get free from all sufferings.

ii) Attainment of Nirvana : Nirvana is not a place or land but a mental form or mental state where all clinging and ignorance are transcended. It is the redemption of the cycle of birth, death and rebirth *(Saṃsâra)*.

iii) Self-Realization : The cessation of suffering is only achieved through personal or self-realization and practice, not through blind faith, worship or external intervention.

4. The Fourth Truth : Providing The Eight Fold Path to the End of Suffering *(Magga)* :-

The Fourth Noble Truth of Lord Buddha is the path leading to the cessation of suffering, known as the Nobel Eight-Fold Path *(Arya Astanga Marga)*. This unique path is the only straight route leading to *Nibbânâ* or *Nirvana*. It provides the practical guide to the end of suffering and enlightment.

This eight-fold path consists of eight interrelated factors/practices, and those factors have been categorized into three main aspects. These are :

1. **Wisdom *(Prajna)* :–**

Eightfold-path

- Wisdom *(Prajna)*
  - * Right Vision *(Samma Ditthi)*
  - * Right Intention *(Sammâ Sankappa)*
- Ethical Conduct *(Sila)*
  - * Right Speech *(Sammâ Vaca)*
  - * Action *(Sammâ Kammanta)*
  - * Right Livehood *(Sammâ Ajiva)*
- Mental Discipline *(Samadhi)*
  - * Right Effort *(Sammâ Vayama)*
  - * Right Mindfulness *(Sammâ Sati)*
  - * Right Concentrate *(Sammâ Samadhi)*

* **Right Vision *[Sammâ Ditthi]* :** Understanding the Four Noble Truth and the true nature of existence such as imparmancee, suffering and non-self.

* **Right Intention *[Sammâ Sankappa]* :** Cultivating intentions of renuniciation, good will, harmlessness etc.

2. **Ethical Conduct [Sila] :-**

* **Right Speech *[Sammâ Vâcâ]* :** Speaking truthfully, kindly, and avoiding harmful speech like lying, gossiping, or harsh words.

* **Right Action *[Sammâ Kammanta]* :** Engaging in ethical behavior, such as refraining from harming living beings, stealing, sexual misconduct etc.

* **Right Livelihood *[Sammâ Ajiva]* :** Choosing a good livelihood that does not harm others or conflict with ethical principles, purifying thoughts, words and deeds at the outset, the spiritual pilgrim's efforts to purify his livelihood by refraining from the forbidden trade.

3. **Mental Discipline *[Samadhi]* :-**

* **Right Effort *[Sammâ Vayama]* :** Making an effort to develop and sustain wholesome states of mind while avoiding unwholesome states. Right effort plays a very vital role in this noble Eight-fold path. By right effort one can remove their rubbish-heap of evil and cultivate these latent virtues.

* **Right Mindfulness *[Sammâ Sati]* :** Cultivating awareness of the body, feeling, mind and mental objects in the present moment. Buddha always says to live in a present moment.

* **Right Concentration *[Sammâ Samadhi]* :** Developing deep mental focus and meditative absorption [Samadhi]. A concentrated mind acts as a powerful aid to see thing as they truly are. And Right effort and mindfulness lead to right concentration.

Those were the brief description of all noble eight-fold paths which lead to the end of suffering. This Fourth Noble Truth emphasizes that liberation from suffering is achievable through disciplined effort and ethical living.

Conclusion :-

Overall, the Four Noble Truths are useful because they provide a framework for dealing with life's inevitable struggles, encouraging a deep transformation of one's mind and heart. By following these techniques one can cultivate their inner peace, develop wisdom and approach life with greater balance and resilience.

All these factors denote the mental attitude of the aspirant who is striving to gain his deliverance.

The Role of Education to Empower Transgender People in West Bengal

Shoaib Mondal [Student, B.Ed. 1st Year]

Introduction :–

Human rights are basic rights and freedoms which are guaranteed to a human by virtue of being a human which can neither be created nor can be abrogated by any government. It includes the right to life, liberty, equality, dignity and freedom of thought and expression. The right to choose one's gender identity is an essential part to lead a life with dignity which again falls under the ambit of Article 21 of the Indian constitution. Determining the right to personal freedom and self-determination, the Supreme Court observed that "the gender to which a person belongs is to be determined by the person concerned. The Court has given the people of India the right to gender identity.

Education & skills development plays pivotal role in enhancing jobs and economic opportunities for an individual. The United Nations Convention of the Rights of Child, 1989 (UNCRC) article 29. 'The education of the child shall be directed to the development of the child's personality, talents and mental and physical abilities to their fullest potential'; and the Constitution of India consider, 'education' as a fundamental right for children for six to fourteen years. Every child of the age of six to fourteen years shall have a right to free and compulsory education in neighbourhood school till completion of elementary education. Promulgation of a separate Act further provides impetus to the government efforts in providing free compulsory education to children, as it has now become constitutional obligation for the state to provide free education.

India has achieved significant growth and development. It has improved on crucial human development indices such as levels of literacy, education and health. There are indications, however, that not all disadvantaged groups have shared equally the benefits of the growth process. Among these, the transgender community, one of the marginalized and vulnerable communities in the country, is seriously lagging behind on human development including education. What is appalling is that despite affirmative action (reservation policies, Right to Education, etc.) the disparities remain substantial among the transgender community in India. Majority of the population is uneducated or undereducated thereby excluding them from participating in social, cultural, political and economic activities.

The life of transgender people is a daily battle as there is no acceptance anywhere and they are ostracized from the society and also ridiculed. They face high levels of stigma in almost every sphere of their life such as health, education, employment, social schemes and entitlement. Extreme social exclusion diminishes self-esteem and sense of social responsibility. The community needs to be included in the mainstream development program of the country and be protected from all forms of abuse and exploitation. Transgender is not a term limited to persons whose genitals are intermixed but it is a blanket term of people whose gender expression, identity or behavior differs from the norms expected from their birth sex. Various transgender identities fall under this category including transgender male, transgender female, male-to-female (MTF) and female to male (FTM). It also includes cross-dressers (those who wear clothes of the other), gender queer people (they feel they belong to either both genders or neither gender) and transsexuals.

According to Indian Census 2011, there are around 4.9 lakh transgender in the country. Census data also reveal that this community has low literacy levels, just 46 per cent transgenders are literate, compared to 74 per cent literacy in the general population, In case of West Bengal, the total number of transgender people is 30,349 (According to the Census of 2011). Of these, 2,376 are children between the ages of 0-6 (According to the Census of 2011). And the total literacy rate of transgender people in West Bengal is 58.83% (According to the Census of 2011).

Historical background of transgender people :–

Members of the third gender have played a prominent role in Indian culture and were once treated with great respect. They find mention in the ancient Hindu scriptures and were written about in the *Ramayana* and *Mahabharata*. In the Mahabharata 'Shikhandi', was a transgender. In medieval India too, they played a prominent role in the royal courts of the Mughal emperors and some Hindu rulers. Many of them rose to powerful positions. Their fall from grace started in the 18^{th} century during the British colonial rule when the Criminal Tribes Act of 1871 categorised the entire transgender community as "criminals" who were "addicted" to committing serious crimes. They were arrested for dressing in women's clothing or dancing or playing music in public places, and for indulging in gay sex. After independence, the law was repealed in 1949, but mistrust of the transgender community has continued. Even today, they remain socially excluded, living on the fringes of society, in ghettoised communities, harassed by the police and abused by the public. Most of them make a living by singing and dancing at weddings or to celebrate child birth, many have moved to begging and prostitution.

Educational Status of transgender people in West Bengal :–

No formal education for transgender is popular in Indian context. Deprived of family and school environment, transgender discontinue their education and risk their future career opportunities. A close analysis of various reports and discussion with community and stakeholders suggest that transgender are most uneducated or undereducated, and they become reluctant to continue schooling. The average qualification is secondary (Matric) or senior secondary level. The enrolment is significantly low and dropout rate at the primary and secondary level is still very high. They are hardly educated as they are not accepted by the society and therefore do not receive proper schooling. Even if they are enrolled in an educational institute, they face harassment and are bullied every day and are asked to leave the school or they drop out on their own. It is because of this that they take up begging and sex work. It is mandatory for the Government to provide inclusive education for transgender students and provide adult education to them. Beside these, some transgender are working in reputed places, Manabi Bandyopadhyay is working as a principal of a Government College in West Bengal.

Some Education Initiatives Taken by the West Bengal Government for the Empowerment of Transgender People :-

West Bengal Government has taken some initiatives for the betterment of transgender people and the initiatives are given below –

[A] In 2019 the West Bengal electronic department (Webel) has announced a plan to train around one hundred Transgender people. They want to bring the community into main stream.

[B] Quite often we have seen that they (transgender) have been deprived of education, employment opportunities, begging on the streets and going through gross neglect. To attend their problems the West Bengal Government has formed a transgender development board.

[C] The state higher education department of West Bengal in a letter dated June, 30, 2016 directed all College principals to build separate toilet for “third-gender students”.

[D] On November 26, 2022 the West Bengal cabinet has decided to allow people from the transgender community to apply for Government jobs under the general category, an official said.

[E] In 2022 around 600 students have enrolled in the third-gender category during registration for the Higher Secondary course in West Bengal.

[F] And the most striking initiative taken by the West Bengal Government is the appointment of India's first transgender principal Manabi Bandopadhyay (Krishinagar Women's College).

These are not mere initiatives, there are also results of these initiative too, for example –

1. Smaranya Ghosh, a transgender, secured the seventh rank in the West Bengal Higher Secondary [Class-12] Examination by scoring 490 out of 500 marks.

2. On 14th June, 2017. School for Skills Allied Health Sciences, a unit of JSV innovations Pvt. Ltd., provided admission to Jiya Das and Debdutta Biswas, two trans, women completely free of cost. This is the first step towards their sustainable livelihood, so that they can be employed in any of the hospitals under the Sirona Hospital group across the State of West Bengal as Nursing Staff. This is in compliance with the promise made by Dr. Satadal Saha, co-founder and CEO of Sirona Hospitals group, in a Panel Discussion addressing employment options for trans, persons organized by Sathrangi.

Role of Education in Empowering Transgenders :–

Education plays a crucial role in empowering and supporting transgenders individuals in several ways.

1. **Awareness and Acceptance :** Education can raise awareness about the diverse sexual orientations and gender identities that exist in society. It helps dispel myths stereotypes and misconceptions surrounding LGBT individuals. By educating people about different sexual orientations and gender identities it promotes understanding tolerance and acceptance.

2. Reduction of Prejudice and Discrimination : Education is essential in challenging prejudice, discrimination and homophobia. By providing knowledge and information about the experiences and struggles faced by LGBT individuals, education helps change attitudes and behaviours. It encourages individuals to be more empathetic and respectful towards sexual and gender diversity reducing the incidence of discrimination and marginalization.

3. Mental Health and Well-being : Education plays a vital role in addressing the psychological, emotional and mental health needs of LGBT individuals. By increasing awareness of the challenges they may face such as societal stigma, bullying and self-acceptance struggles. Education can help create supportive environment within schools, colleges and communities. This enables them to access appropriate mental health services and resources fostering their well-being.

4. Supportive Policies and Legislation : Education plays a significant role in advocating for policies and legislation that protect the rights of LGBT individuals. It can help create a safe and inclusive environment that supports equality and non-discrimination. By educating individuals about the importance of equal rights and the harmful consequences of discrimination, education encourages individuals to support in legislative policy changes that protect LGBT rights.

5. Empowerment and Self-advocacy : Education provides LGBT individuals with knowledge, skills and resources necessary for self-advocacy and empowerment. By teaching them about their rights encouraging self.

Challenges and Solutions of Transgender Education :-

Transgender education faces several challenges that hinder the effective dissemination of knowledge and support for transgender individuals. These challenges can impact not only the transgender community but also the broader society. Here are some key challenges –

1. Lack of Inclusive Curriculum : Transgender issues are often overlooked or excluded from educational curricula. This can perpetuate biases, stereotypes and misconceptions about transgender individuals. Inclusion of transgender experiences and societal contributions in curricula can help promote understanding and acceptance.

2. Limited Resources and Training : Many educators lack the necessary resources, knowledge and training to effectively address transgender issues in the classroom. This can lead to a lack of support for transgender students and limited ability, harassment and discrimination in educational settings. This can negatively impact their mental health, educational outcomes and overall well-being. Efforts are needed to foster safe and inclusive environment that promote equal treatment and respect for all students.

3. Insufficient Policies and Legal Protections : In many regions there is inadequate legal protection for transgender individuals including students. This can result in a lack of clear policies and guidelines for addressing issues such as bathroom access preferred names and pronouns and participation in sports and other activities. The absences of supportive policies can contribute to a hostile environment for transgender students.

4. Lack of Access to Healthcare : Transgender students may face difficulties accessing gender-affirming healthcare including hormone therapy, mental health support. Transgender students often lack visible role models and positive representation in educational materials, textbooks and media. Increasing representation can help challenge stereotypes, reduce stigma and create a more inclusive learning environment.

Solutions :-

Addressing these challenges requires a multifaceted solution or approach involving policymakers, administrators, educators, students and the broader community. It involves creating inclusive curricula providing professional development and training for educators implementing strong anti-bullying and anti-discrimination policies ensuring access to gender-affirming healthcare promoting visibility and representation and fostering a culture of acceptance and respect for all individuals regardless of their gender identity.

Conclusion :-

Each being in this Universe is indeed unique, and an integral part of Nature. It would thus be wrong to judge and discriminate people who may be different from the stereotype, which again is man-made. It is time that people realize that every individual in this country has equal rights and privileges, and follow the policy of "live and let live". And we have to remember one thing : education is the essential part of our lives. Besides teaching men and women, there is a need to educate the trasgender people. Education provides them a common ground in order to fight for them. Hopefully one day with the help of education, LGBT people will come out as eminent individuals.

Why do I prefer gender justice to gender equality ?

Md. Masihur Rahman Ansari [Student, B.Ed. 1st Year]

Your preference for gender justice over gender equality in light of Islam reflects a nuanced understanding of how Islamic principles address gender dynamics. Let's explore this perspective further.

Gender Equality vs. Gender Justice :-

1. Gender Equality : This concept emphasizes treating men and women the same; in all aspects, assuming that fairness stems from identical treatment. However, it may overlook inherent biological, emotional, and social differences between genders.

2. Gender Justice : Rooted in fairness, this concept recognizes the unique roles, responsibilities, and capacities of each gender. It seeks to provide equitable treatment, ensuring that everyone receives what they require based on their specific needs and circumstances.

Gender Justice in Islam :-

Islam emphasizes justice ('adl) as a foundational principle. It acknowledge, differences between men and women while ensuring fairness in rights and responsibilities. Here's how gender justice manifests in Islamic teachings –

1. Spiritual Equality : Both men and women are equal in their relationship with Allah. The Quran states –

➻ "Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you." [Quran 49:13]

Accountability and rewards in the Hereafter are based on individual deeds, not gender.

2. Complementary Roles : Men and women have distinct but complementary roles in society. For example, men are traditionally tasked with financial responsibility (qawwamun], while women have unique roles in nurturing and care giving.

These roles are not about superiority or inferiority but about functionality and balance.

3. Fair Distribution of Rights : Women have specific rights, such as inheritance, education, and financial independence. For instance, while a daughter receives half the inheritance of a son, her financial responsibilities are not the same. This reflects justice rather than equal division.

4. Protection against Oppression : Islam strongly prohibits the mistreatment or exploitation of women. The Prophet Muhammad [peace be upon him] said –

➻ "The best of you are those who are best to their women." [Tirmidhi]

5. Flexibility and Contest : Islamic laws adapt to context and needs, ensuring justice. For example, in family life, men and women are encouraged to mutually agree on roles rather than rigidly adhering to fixed rules.

Why Gender Justice Aligns Better with Islam ?

Justice ensures fairness while respecting differences.

It prevents the erasure of gender-specific identities and contributions.

It addresses the broader context, taking into account societal. historical, and individual factors.

Islam's emphasis on gender justice challenges the extremes of rigid traditionalism and modernist equality narratives, offering a balanced and holistic approach to gender relations. This framework upholds human dignity and harmony in society while staying true to divine guidance.

Modern Research Supporting Gender Justice :–

Modern research increasingly validates the importance of gender justice over uniform equality by recognizing biological, psychological and social differences between men and women. Here are key findings –

Biological and Psychological Differences –

1. Neuroscience and Cognitive Abilities : Studies in neuroscience (e.g., by Dir. Louann Brizendine in The Female Brain) reveal that men and women have distinct brain structures and hormonal influences, affecting emotions, behavior, and decision-making.

Women are shown to excel in empathy, multitasking, and communication, while men often excel in spatial reasoning and risk-taking.

2. Emotional Processing : Research by Dr. Daniel Goleman (author of *Emotional Intelligence*) shows women often have higher emotional intelligence, which plays a vital role in caregiving and nurturing roles.

Social and Cultural Studies :-

3. Complementarity in Roles : Research by the Pew Research Center highlights that societies thrive when both genders collaborate in roles that suit their strengths rather than enforcing identical roles.

Studies in family dynamics (e.g., by Dr. John Gottman) show that traditional yet equitable role-sharing in households leads to healthier relationships and children's well-being.

4. Workplace and Leadership : Research by McKinsey & Company shows that workplaces with gender-diverse leadership perform better when roles align with individual strengths rather that forcing identical expectations.

Critique of Absolute Equality :–

5. Negative Effects of Forces of Equality : Overemphasis on gender equality has sometimes led to burnout, role confusion, and dissatisfaction. For example, a 2020 study in the Journal of Family Issues found that shared parenting without considering natural inclinations often increases stress for both genders.

6. Economic Impact : Research by Harvard economist Claudia Goldin shows that flexibility in roles rather than identical career paths allows women to balance professional and familial responsibilities effectively.

2. Gender Justice as a Balanced Approach :-

Islam provides flexibility for men and women to share responsibilities based on mutual agreement, as seen in the Prophet Muhammad's [peace be upon him] household.

The emphasis on justice ensures women are not burdened with financial duties unless they willingly contribute, while men are obligated to provide.

Modern psychology and sociology suggest that fair division of roles based on strengths ensures better societal harmony. This aligns with Islam's approach of distributing responsibilities in a just and complementary way.

Conclusion :-

Gender justice, as understood through Islamic principles and supported by modern research, provides a framework that respects differences while ensuring fairness. Unlike gender equality, which seeks sameness, gender justice fosters societal harmony by aligning roles with natural capacities and individual strengths.

This approach highlights the wisdom of Islamic teachings, ensuring that both men and women are empowered, valued, and protected in their unique roles without undermining their shared dignity.

Dramatic Passage of Time

Krishnasish Dasgupta [Student, B.Ed. 1st Year]

Lessons learnt inside a sub-urban train compartment :–

Asim *babu*, the octogenarian kept on telling me – time is limited. He further went on explaining – If you lose wealth, that can be gained. If you lose your home, even that can be somewhat attained. On the flip side, if you lose track of your time, that is like an irreplaceable loss. I meanwhile nodded and undoubtedly it seemed to be a very introspective, reflective statement.

Losing track of time and the local train journey we both were incidentally taking made a remarkable eerie connection. The track of time and a moving local train on a track sort of knowingly or unknowingly produced a similar symbolic semblance.

Time and again, it reminded me of the philosophical notion that here in universe, our time is indeed limited.

Inside a suburban train compartment, initially Asim *babu* and I had exchanged glances – I in my mid 30s and Asim *babu* possibly in his 80s. I could never even dream in my wildest dreams that the dollops of advices from his end will leave a profound impact on how I look at my life from here on.

The close-to-half-an-hour interaction with him also evinced the fact that all throughout I have gelled well with aged people irrespective of their gender. Since when you end up interacting with people elder than you, you really get to learn a lot. In short, you literally have nothing to lose.

Further, Asim babu went on narrating myriad anecdotal experiences, mainly revolving around his professional and personal life. Very subtly, he added – "Young man, you must be in a position to transform your negative emotions into precious, positive ones." Again, all I could manage to do was slightly nod. It is seemingly a difficult process. I realized it indeed takes time.

We must prioritize self-care and well-being among ourselves. The onus is on us to change our recurrent negative beliefs and convert those into positive ones. That way, we are actually inviting great opportunities to come in our way. We must never be complacent.

For instance, if one does well and gets selected in a particular job, he or she must continuously strive hard to do well in the next phase of life as well.

Asim *babu* took a deep breath. My wrist-watch ticked quite abruptly. Passengers by now were starting to dwindle.... In a somewhat reflective mood, he remarked that, Life will continue to test us. Pain indeed changes people. Life will certainly test your character before eventually blessing you with all the good things.

This chance encounter with a man like him is one particular experience that ended on a rather bitter-sweet note. I call it 'bitter-sweet' because relationship with fellow travelers is like something pretty momentary.

Honestly, we can never deny the importance, the four-lettered word called 'Time' has on our lives. Time is fleeting.... Somehow, we get sucked into the vortex of a vicious cycle that sternly refuses to let go!

A chance encounter such as this although brief can actually leave a profound impact on our otherwise topsy-turvy life. Certain incidents can end up being life-altering episodes for us. We must always try to believe that out of the ordinary, something wondrous is going to happen and the many, minuscule stories shaping our lives will never be the same again!

Before I could bid farewell, Asim *babu* had already got off. For me, personally, without his presence, the train-compartment was never be the same again.

And Life went on.... It was definitely not the same again. But, honestly, I did become a more wiser individual.

Shaping Minds in the Digital Era : The Dual Impact of Modern Technology on Students and Education

Sabyasachi Sharma [Student, B.Ed. 1st Year]

In today's rapidly changing world, technology has become an integral part of our lives, influencing how we interact, work, and study. It has permeated almost every aspect of modern civilization, becoming an essential tool for advancement and creativity. For students, modern technology has drastically transformed the educational system, converting old teaching and learning techniques into more dynamic and accessible experiences. From virtual classrooms that deliver education to remote corners of the world to AI-powered tools that tailor learning to individual needs, the developments are nothing short of transformative.

However, while technology has created numerous opportunities for innovation and progress, it has also generated significant obstacles that must be addressed. Along with its benefits, technology has had a negative impact on students by creating distractions, encouraging over-reliance, and even contributing to social and mental health problems. These two consequences underline the importance of adopting technology into education through a balanced and strategic method.

The Role of Modern Technology in Education

Modern technology has changed how education is delivered, making it more accessible, interactive, and personalized than ever before. We all know that, it has removed geographical and economic boundaries, allowing millions of students worldwide to learn, connect, and grow in ways that were unthinkable a few decades ago. However, while technology has improved education, it has also produced some issues that must be addressed carefully.

Access to Knowledge Anytime, Anywhere :-

One of the major benefits of modern technology is its ability to make knowledge available to anybody, regardless of location or financial situation. With the introduction of the Internet, students can now access online libraries, e-books, academic publications and educational platforms from anywhere in the world. Websites such as Khan Academy, Google Scholar, and Coursera a offer high-quality educational resources for free.

Consider a student living in a remote village without access to good schools or teachers. With a Smartphone and an Internet connection, this student can take online coding courses, learn advanced mathematics, or compete in global contests. Such accessibility enables students to venture outside the boundaries of their classrooms, bridging the gap between rural and urban education.

Personalized and Collaborative Learning Improves Student and Teacher Growth:–

Technology is changing education, making it more interactive and personalized for both professors and students. Computer laboratories, Internet connection, and smart classrooms are becoming standard in schools. These make learning more effective and interesting for kids. In order to prepare pupils for the future, the curriculum frequently includes digital instruction and basic computer training. For instance, teachers in smart classrooms make classes easier to comprehend by using slideshows, films and digital whiteboards to clarify subjects. Through practical experience with technology, computer laboratories teach kids critical skills like typing, coding and safe Internet usage. These resources not only make studying enjoyable, but they also speed up students' understanding of challenging material.

Technology becomes increasingly important as learners enter college and pursue higher education. To teach increasingly complicated subjects, professors employ sophisticated study resources including PowerPoint presentations, online manuals and video lectures. Online resources like research papers and e-books are available to students, aiding in their test and project preparation. With help of platforms like Google Docs, Microsoft Teams, and Zoom, group collaborations have also increased. Students can now collaborate, exchange ideas, and finish tasks regardless of where they are. Teachers gain from technology just as much as students do. They can communicate with students more successfully, share study materials instantaneously and even monitor each student's progress with the use of tools like online teaching platforms. In order to enhance their own teaching abilities and provide students the greatest learning experience possible, educators can also take part in webinars and seminars.

Learning Beyond the Syllabus and Gaining Real-Life Skills :-

Students can now learn far beyond the boundaries of traditional curriculum. Thanks to modern technology, which has completely changed the way they learn. With the abundance of materials available online, including blogs, YouTube tutorials, and educational Websites, and online courses, students can now explore and master practical skills that were previously thought to be unattainable. Comprehensive programs in coding, video editing, 3D modeling, and even app development are available on platforms like Udemy,

Codecademy and Skillshare, assisting students in getting ready for jobs in cutting-edge industries. A paradigm shift has been brought about by the availability of practical, industry-relevant skills. Nowadays, careers like visual effects, digital marketing, and graphic design are taught to students and even adults via online. Along with expanding their education, these options are paving the way for them to become financially independent through business, content production, and freelancing. For instance, a student who is interested in film making can use costly online classes or free YouTube videos to acquire advanced editing methods using programs like Adobe Premiere Pro.

Additionally, technology has significantly improved language proficiency, especially in English. Grammarly, Hello Talk, and Duolingo are just a few of the interactive language-learning resources available to students. Their communication skills have also improved as a result of global connections on social media and other digital platforms, equipping them for a globalized labor market.

Nevertheless, there are certain disadvantages to this technical development. Even while these tools have a lot of potential, using them excessively can impair one's capacity for critical thinking and problem-solving. Students frequently turn to technology to solve problems quickly, which could impede their ability to study deeply and become independent. Additionally, the emphasis on technical abilities can occasionally obscure the significance of interpersonal communication, emotional intelligence, and ethical awareness – skills that are just as important for both professional and personal development.

The digital divide presents another difficulty. While some students gain a lot from these resources, others suffer because they lack access to devices or dependable Internet, particularly those who live in rural or disadvantaged locations. Contrary to technology's inclusive potential, this widening divide results in differences in learning possibilities.

Developing independent learning habits, emotional intelligence, and ethical practices must coexist with incorporating real-life skills into education in order to guarantee a balanced approach. Unquestionably, technology is a powerful enabler, but in order to properly educate kids for a successful and comprehensive future, its function must be supplemented by human leadership.

Negative Impacts of Technology on Students and Education

Although modern technology has had a significant impact on education, there are a number of drawbacks that should be noted as well. The excessive and inappropriate use of technology has caused worries about how it may affect students' general development in both higher education and the classroom. These difficulties have got worse in recent years, particularly as technology has been more widely used in India and around the World.

Distraction and Decreased Concentration :-

Despite being an educational tool, technology frequently diverts students' attention from their academics. originally intended for instructional objective, smartphones, tablets and laptops end up serving as entry points to social media, gaming, and entertainment. The constant bombardment of notifications is difficult for students, particularly younger ones, to ignore. They spend hours of their day on platforms like YouTube, Instagram, and TikTok, which leaves little time for concentrated study. Children frequently abuse their access to computers or tablets in classroom by viewing non-educational content. Similar difficulties are encountered by college and university students, who are supposed to have stronger time management skills. Many people get lost in binge-watching television or incessantly scrolling through social media, which causes them to postpone their tasks or miss deadlines. This diversion impairs their focus and has an impact on their academic achievement.

Over-Reliance on Technology :-

The over-reliance on technology for learning and problem-solving is another important challenge. Students are losing the ability to think critically and solve problems on their own as a result of applications that provide pre-made solutions and calculators that can solve fundamental math problems. Children in schools frequently turn to search engines for solutions rather than attempting to solve problems on their own. College students also rely too much on online resources like Grammarly, which deters them from improving their writing and critical thinking abilities.

Concerns over the lack of independence are raised by this dependency. When immediate technical support is absent, students may find it difficult to function in real-life scenarios, which might reduce their capacity to prepare for issues in the future.

Health Concerns from Excessive Screen Time :-

Students' prolonged use of digital devices has resulted in a number of health issues. Eye strain, often known as digital eye strain, is a frequent problem brought on by extended screen use. Due to excessive screen time, many kids also suffer from headaches, dry eyes, and blurred vision. Screen blue light interferes with sleep cycles, causing fatigue and insomnia.

Another issue is physical inactivity. Younger learners frequently skip outside activities in order to spend more time on their electronics, which leads to obesity and other health problems. Even college and university students would rather engage in indoor, screen-based amusement than engage in exercise, which could have long-term effects on their health.

Negative Effects of Social Media :-

Social media has a negative aspect that significantly affects students, even while it provides chances for networking and contact. Younger students are particularly prone to the exaggerated ideals of success, beauty, and lifestyle that are promoted on social media sites like Instagram and Snapchat. They frequently make comparisons between themselves and celebrities and influencers, which can cause anxiety, despair, and feelings of inadequacy.

Another concerning problem is cyberbullying. Online harassment has a negative impact on the mental health and self-esteem of many pupils. Students are more worried with virtual approval than real-life achievements as a result of the ongoing pressure to maintain an online identity. Addiction to social media also has an impact on communication between people. Students' preference for virtual communication over in-person contact hinders the growth of their social skills. One important component of emotional development is the pleasure of direct interpersonal contacts, which younger children in particular are losing touch with.

The Digital Gap and Unfair Access :-

Even though technology is widely used in classrooms, children in underserved and rural locations are still unable to make use of its advantages. This digital divide was made very evident during the COVID-19 pandemic. Rural pupils struggled without access to devices or the Internet while metropolitan schools made the switch to online instruction. Millions of students in India are falling behind in the fight for education because so few rural homes have access to computers or dependable Internet. A growing disparity in educational possibilities results from this inequity, giving affluent pupils a competitive advantage while others find it difficult to catch up.

Lack of Originality and Plagiarism :-

A culture of copying and pasting has been fostered by the ease with which material can be found online. In order to finish projects, students frequently copy and paste text from websites without comprehending or changing it. This behavior restricts critical thinking and creativity, two qualities that are vital for academic development. Plagiarism has become a major issue in higher education. Unaccredited content is common in research papers and projects, which compromises academic integrity and prevents real learning.

Decreased Social and Physical Activities :-

Students participate in fewer outside activities and in-person encounters as they spend more time on their devices. Numerous health problems, including obesity, reduced immunity, and low physical fitness, are brought on by this sedentary life style. Furthermore, the development of interpersonal and communication skills is hampered by the absence of

real-world social interaction. Instead of doing sports or engaging in social activities, kids are observed playing games on their iPads in classrooms. College students' preference for virtual collaborations over face-to-face conversations has an impact on their capacity to form deep connections and develop collaborative abilities.

Stress Caused by Technology :-

Students experience a great deal of stress as a result of the ongoing need to stay current with emails, notifications, and online assignments. While college students struggle with FOMO or the fear of missing out on academic developments or social media trends, younger children frequently feel overburdened by the amount of online work. Students who experience burnout as a result of this stress may become disconnected and unmotivated. It becomes difficult to strike a balance between social media, academics, and personal leisure, leaving little time for rest and mental refreshment.

Conclusion : Balancing the Gift of Technology with Responsibility

In the field of education, contemporary technology represents a double-edged sword that presents both huge possibilities and difficult obstacles. It has broken down barriers. It has broken down barriers of time, place and accessibility, allowing kids to explore, learn, and succeed like never before. Technology has completely changed the educational scene, from giving university students access to cutting-edge skills to allowing rural learners to attend virtual classrooms. But there is a price for this incredible advancement.

Unrestrained technology use has made it harder to distinguish between a tool for personal development and a source of stress, distraction, and reliance. Students run the risk of losing touch with social ties, critical thinking, and even their physical health as they immerse themselves in the digital world. Social inequality is exacerbated by the widening gap between those with and without access to technology.

The real challenge lies in mastering the art of balance – harnessing the power of technology while preserving the essence of human connection, creativity, and integrity. In order to promote complete growth and inspire students to invent and explore without sacrificing their emotional and social development, schools and institutions must work to integrate technology in meaningful ways.

It is our shared duty as educators, parents, and students to make sure that technology serves as a tool for meaningful learning and living rather than as a roadblock to a better future. The future requires not just more intelligent tools but also more intelligent decisions, converting education into a synthesis of ageless knowledge and digital innovation.

Reminiscence of Yellow Flowers

Gairik Misra [Student, B.Ed. 1st Year]

Tanvi had not thought of the street in years, but one afternoon a flash of sunlight caught her eye as it filtered though the trees, as if a reminder from distant heaven and she remembered, that street. That place, buried deep in the corner of her memories, as distant and forgotten as a half-sketched dream, which now, felt urgent. Her childhood, a time when everything was simpler, clearer seemed to wait for her there, in the folds of an old memory.

The street had been a ribbon of yellow leaved trees that round themselves through a field of yellow flowers with an ancient oak in the centre. The oak appears to be her majesty, in her court of yellow petalled flowers. Tanvi, as a child, has always wondered if the field was a secret residence of fairies hiding inside each flower. The oak to be the castle of the fairy queen who, if Tanvi was lucky may meet one day. As a child, she had walked the field everyday barefooted cherishing the joy that every flower brought her, in breeze of spring when sun's light turned it to gold. But then it disappeared, or so she thought, when her family moved to the other side of the town. Time now had collapsed the space between then and now, so she needs to see it again, to reclaim it. To witness if the warmth of her childhood still lingered there. So she left without a word, the streets of her now fading behind her as she made her way to the other side of the town but an unfamiliar dread seemed to slowly engulf her as she didn't know what to expect. The street was a phantom in her mind, a place that could only exist in memory.

As she walked, the air appears to grow thick with the smell of wet soil after rain; the summer warmth had faded into cold, a chill she felt on her spine. Everything is now quieter, the sound of the busy streets, of people, of birds seemed to be dissolved in the afternoon stillness. An unnatural quietness. The silence was broken by an old man "Where are you going, fragile lady?" Tavni turned and found an old man standing. His hair dirty and grey, staring at her with a smile, the most unsettling smile imaginable; yellow, rusted teeth with the look of the old wolf, the same that may be what little red riding woods may have faced. "I am looking for a place", Tanvi replied. "A street, I think it used to be here." The old wolf scratched his head. "A street, that will lead you to nowhere ? It is not the road, is it ? But the memory of what you have lost?" Saying this the old wolf let out an almost melancholic laugh. "You will find it, but not as you remember, for instance, maybe it's teeth will be sharper."

Tanvi frowned and walked on not wanting to engage further, to forget her last encounter she look around for a trace of familiarity. She should be her by now as her memory serves her. Everything had changed. The houses, the trees nothing was as she remembered them to be. Soon she found herself at the corner of an empty lot. The street was gone, the yellow leaved trees were gone, and Tanvi's kingdom of fairies, the golden field is now just dirt and weeds, empty.

Tanvi's eyes were almost filled with tears when a voice broke through her thoughts. "My child, are we looking for something?" Tanvi turned towards the voice. There stood a woman in the shadows, her face obscured by the veil of her tangled messy hair. She was holding what seem to be an old hand mirror in one hand and an apple in the other. She seemed to young middle aged may be in her early thirties, but her eyes were grey and cold as sky before storm, which held in themselves the kind of weight that spoke of someone who had lived through lifetimes. "Yes", said Tanvi, her voice was shaky. "I thought this was a place I knew, it was my favourite place." The woman didn't smile. "Is it really your place ? Or is it what you, child wanted it to be?" she stepped closer as silent as feathers fall on ground. "Aren't we all not looking for what that is already gone? People, places, memories – things that never belonged to us to begin with." Tanvi's hands turned snow, and her mind white, she is just staring blankly at her loss for words. The mirror's owner now turned towards the shadows saying "Tell me child, what do you think happiness is? Is it what you left behind or what you may never find again?" Before Tanvi could answer she disappeared into the shadows.

Tanvi stood alone. Her hands and feet shaking. The memory of the place she had been searching up until now seemed to drift away as if it never existed to begin with. Then, the silence was broken again by the sound of a cart. Tanvi turned towards the sound to see, a man emerged from the shadows dragging a rusted cart behind him. He was wearing a hat, the most bizarre hat imaginable, his face twisted with madness, eyes big and wild. "Where are you going traveler?" he said taking a deep breath. "Do you know the way back? Or are you already lost?" Tanvi almost in tears said "I don't know. I hoped to find something here." The man let out a mad laugh. "Find, search, quest? Tell me, what matters most – the search or the finding? One seeks, and searches just to arrive to find out it was never about the destination at all." Tanvi feels the weight of the man's words as if massive boulders were suddenly dropped at her by some invisible giant. She didn't know what she was hearing was madness or truth. To her the world has suddenly turned into a strange, cold, dark, place, one where answers only led to more questions. "Why did they leave?" Tanvi asked, "Why do everything must leave? Why does the place I loved have to be gone?" The man's eyes widen as he looked at Tanvi. "Why did they leave? Why do the

Sun set? Why does the Moon rise? Everything moves, changes and alters. It is the way of things." He smiled an empty smile, his eyes gleamed with a twisted clarity.

"What is abandonment, anyway? Is it a betrayal, or a release? To be left behind, is it not to be forgotten, or to be freed?" Tanvi does not know how to respond. "I'm not sure", Tanvi whispered, more to herself than to the stranger. "Then you will learn." Saying this the mad stranger with the most bizarre hat imaginable left.

Tanvi stood alone; her chest heavy, the sun began to sink below the horizon. Tanvi looked at the place for last time and whispered to herself, "Maybe the way back is forward." She turned back leaving behind what she desired the most, the questions still hanging around her like those invisible fairies that used to reside on those yellow flowers that once bloomed, but no longer did.

The Educational Disparity between Rural & Urban Areas in West Bengal : Current Situation and How Unemployment Shapes Public Perception of Education

Ariful Gazi [Student, B.Ed. 1st Year]

The educational disparity between rural and urban areas in India is a significant issue that has been shaped by numerous socio-economic and policy-driven factors over the years. At its core, this disparity is intricately linked with the employment opportunities, or the lack of it, provided by the government and other sectors. This has led to a shift in the way people from rural and urban regions view education, with a stronger inclination towards immediate job prospects rather than educational achievements, particularly in the rural areas. In West Bengal, as in much of India, education is considered a vital tool for upward socio-economic mobility. However, the state's long-standing struggle with unemployment, particularly with the irregular provision of government jobs, has begun to alter this perception, especially in rural areas. The result has been a growing disillusionment with education as a pathway to success, replaced by a pragmatic emphasis on work and income generation. This shift in mindset has profound implications for educational equity, aspirations, and the overall development of the region.

Historically, West Bengal has been a hub of educational and intellectual pursuits. From the times of the Bengal Renaissance, which produced visionaries like Rabindranath Tagore, Swami Vivekananda, and Ishwar Chandra Vidyasagar, education has been seen as a powerful force for societal change. In fact, Bengal's early leaders focused on reforming the educational system as a means to uplift society, and educational institutions in Kolkata and other urban centers attracted students from all over India. However, the educational landscape in West Bengal has been a tale of two worlds, urban and rural. While cities like Kolkata flourished with prestigious schools, colleges, and universities, rural areas lagged behind in terms of both infrastructure and access to quality education. The gap between the quality of education in urban and rural areas widened over time due to several factors, including economic disparities, infrastructure development, and the concentration of intellectual and financial resources in urban centers.

The post-independence period in West Bengal saw a gradual decline in industrial activity, especially after the 1970s. The state's economy, once buoyed by industries like jute and textiles, began to stagnate, and with it came high unemployment rate. The problem worsened as agricultural productivity also slowed down due to various factors, including fragmentation of landholdings, lack of modernization and inconsistent government support. Over the decades, West Bengal's government jobs, long seen as secure and prestigious, have become increasingly scarce. Government positions in teaching administration and public service, once an attractive career path for the educated middle class, are no longer readily available. The irregularity in job recruitments and the slow pace of filling vacancies have caused frustration among job aspirants, especially in rural areas where alternative employment opportunities are limited. As a result, people in these regions, particularly the economically weaker sections, have begun to reassess the value of education. When an educated individual fails to secure a job even after years of academic effort, it sends a disheartening message to families and communities. Consequently, in rural areas of West Bengal, education is increasingly viewed as an unreliable investment, whereas immediate work and earning money are perceived as more pragmatic and necessary.

This growing shift in perspective has led to a marked difference in how education is perceived in rural and urban areas. In urban centers like Kolkata, education is still largely seen as essential for social mobility and career success. Middle and upper-class families in cities invest heavily in private schooling, extracurricular activities, and coaching centers to ensure their children excel academically and secure competitive positions in engineering, medical, and civil service. In contrast, rural families, especially those with limited resources, often see education as a luxury they cannot afford. The harsh realities of poverty and unemployment mean that children expected to contribute to the family's income as early as possible. In many cases, young adults forgo higher education altogether in favour of menial labour, agricultural work, or migration to cities for low-paying jobs. For these families, the primary focus is on securing immediate work rather than pursuing educational qualifications, which they believe may not yield substantial returns. The psychological shift in rural areas, therefore, revolves around the notion that education does not guarantee employment. The scarcity of government jobs, along with a lack of viable alternative employment opportunities in rural areas, has convinced many families that practical skills and work experience are more valuable than formal education. This belief is passed down through generations, and children are often encouraged to focus on work from a young age, with education taking a back seat.

The differences in educational perception have resulted in systemic challenges for West Bengal's educational infrastructure, especially in rural areas. While urban schools

continue to flourish with better facilities, qualified teachers, and access to digital learning tools, rural schools often suffer from a lack of resources. Many rural schools are plagued by inadequate infrastructure, high student-teacher ratios, and a shortage of well-trained educators. These issues exacerbate the educational divide between rural and urban areas, as students in rural schools receive an inferior education compared to their urban counterparts. The dropout rate in rural areas is another major concern. Faced with economic hardship, many families prefer to send their children to work rather than to school. Child labour, though illegal, remains prevalent in rural areas where families struggle to meet basic needs. As a result, the dropout rate in secondary and higher education is significantly higher in rural West Bengal compared to urban areas. Moreover, girls in rural areas are often forced to leave school early due to early marriage, household responsibilities, or societal pressures, further widening the gender gap in education. The emphasis on immediate work over education also impacts the quality of human capital in the state. Without access to quality education, rural youth are often relegated to low-skill, low-paying jobs, perpetuating the cycle of poverty. The lack of skilled workers also hampers the overall economic development of rural areas, as industries are reluctant to invest in regions where the workforce lacks the necessary educational qualifications.

The psychological impact of this shift in educational priorities is significant. In rural areas, where the focus is on survival and economic stability, education is increasingly viewed as a luxury rather than a necessity. This mindset can lead to a sense of resignation and hopelessness, as individuals believe that no matter how much they study, they will not be able to secure a well-paying job. Over time, this belief erodes the aspirations of the younger generation, leading to a lack of motivation to pursue higher education or academic excellence. This stark contrast with urban areas, were education is still highly valued, can create a sense of inequality and marginalization among rural youth. The pressure to conform to societal expectations of work and income generation can also cause psychological stress, particularly among students who may wish to continue their education but are discouraged by their families or communities.

The West Bengal Government has introduced several initiatives aimed at improving education including schemes to provide free textbooks, uniforms, mid-day meals and various projects such as Kanyashree, Rupashree, provides free by-cycle and giving scholarships like SVMCM, Aikyashree, while these initiatives address some of the immediate needs of rural students, they do not tackle the deeper issues of unemployment and the devaluation of education.

The educational disparity between rural and urban areas is driven by economic challenges and a shift in societal priorities. The scarcity of government jobs and the lack of alternative employment opportunities have caused many rural families to prioritize work over education. To reverse this trend, it is critical to address the root causes of unemployment and create an environment where education is once again seen as a valuable investment in the future. To bridge the educational gap between rural and urban areas, the government must focus on creating sustainable employment opportunities in rural regions. Revitalizing rural industries, investing in agricultural modernization, and promoting skill development programs can help provide rural youth with viable career options that do not require migration to urban centers. Furthermore, strengthening the educational infrastructure in rural areas, improving teacher education and ensuring the regular recruitment of qualified educators are essential steps toward creating a more equitable educational system.

A Symphony of Flavors : The Story of Biryani

Atique Ejaz [Student, B.Ed. 1st Year]

Biryani, a dish that transcends borders and cultures, is a culinary masterpiece that has captivated taste buds across the globe. This fragrant and flavorful rice dish, a harmonious blend of meats, vegetables, spices and aromatic rice, is a testament to India's rich culinary heritage.

➼ A History of its Origins :-

While the exact origins of biryani remain shrouded in mystery, several captivating legnds and historical accounts offer compelling possibilities.

1. The Mugal Connection : One popular theory suggests that biryani was introduced to India by the Mughals, the Persianate dynasty that ruled much of the subcontinent for centuries. The word "biryani" itself is believed to be Persian origin, derived from the word "birian", meaning "fried before cooking." The Mughals, with their penchant for elaborate feasts and fusion cuisine, are thought to have adapted and refined existing rice dishes, incorporating Persian influences to create the biryani we know today.

2. A Royal Treat : Another legend attributes the creation of biryani to Mumtaz Mahal, the beloved wife of Mughal Emperor Shah Jahan. It is said that she once visited army barracks and found the soldiers undernourished. To provide them with a nutritious and satisfying meal, she instructed the royal chefs to create a dish that combined meat, rice and spices. The result was biryani, a dish that quickly gained popularity among the Mughal court and eventually spread throughout the region.

➼ A Regional Odyssey :–

Over time, biryani evolved into a diverse family of dishes, each with its own unique regional variations. From the fiery Hyderabadi biryani to the delicate Lucknowi biryani, each region boasts it own distinct style and flavor profile :

1. Hyderabadi Biryani : This iconic dish from Hyderabad, known for its bold flavors and generous use of spices, is a true testament to the region's culinary prowess. It features succulent meat, often mutton or chicken, cooked with aromatic spices like saffron, cardamom, and cloves. The rice, often basmati, is layered with the meat and cooked slowly over low heat, allowing the flavors to meld together seamlessly.

2. Kolkata Biryani : This unique variation, born out of the fusion of Awadhi and Bengali culinary traditions, features potatoes as a key ingredient. The potatoes, cooked along with the meat and rice, add a delightful texture and flavor to the dish.

3. Lucknowi Biryani : Renowned for its subtle elegance and delicate flavors, Lucknowi biryani is a masterpiece of culinary artistry. The meat, typically mutton, is marinated for hours in a fragrant yogurt-based marinade before being cooked with the rice. The result is a biryani that is light, flavorful, and exquisitely fragrant.

The Art of Biryani Making :-

The art of biryani lies in its meticulous preparation. Marinating the meat in fragrant spices is the key. Then, layers of rice and meat are carefully arranged and cooked slowly using the "dum" method, where the pot is sealed to trap steam and infuse flavors. The right blend of spices, like cardamom, cloves and cinnamon, and the choice of fragrant basmati rice are crucial for a perfect biryani.

Conclusion :-

Biryani is more than just a dish; it is a cultural symbol, a culinary legacy that has been passed down through generations. It is a dish that evokes memories of festive gatherings, family celebrations, and shared meals. The aroma of biryani wafting through the air is enough to transport one to a world of sensory delights, evoking a sense of nostalgia and warmth. Today, biryani continues to evolve, adapting to new tastes and preferences while retaining its core essence. From street food stalls to fine-dining restaurants, this beloved dish continues to captivate and inspire food lovers around the world. Whether enjoyed with family and friends or savored in solitude, biryani remains a timeless culinary treasure, a symphony of flavors that celebrates the rich and diverse culinary heritage of India.

The present Governing Body of the College

1.	**Hon'ble Justice Pinaki Chandra Ghose**	Retd. Judge, Supreme Court (Former Lokpal of India)	***President*** of the Governing Body
2.	**Swami Jayananda**	Secretary of Ramakrishna Mission Boys' Home, Rahara	***Secretary*** of the Governing Body
3.	**Swami Nirishananda**	Principal (Actg.) of Ramakrishna Mission Brahmananda College of Education, Rahara	***Asst. Secretary & Ex-Officio*** of the Governing Body
4.	**Dr. Sanjiban Sengupta**	WBES, Associate Professor of Govt. Training College, Hooghly. Former JDPI, Govt. of West Bengal	***Member*** of the Governing Body (Government Representative)
5.	**Dr. Kausik Chatterjee**	Associate Professor of Satyapriya Roy College of Education, Salt Lake, Kolkata-700064	***Member*** of the Governing Body (University Representative)
6.	**Swami Kaivalyananda**	Asst. Secretary of Ramakrishna Mission Boys' Home, Rahara	***Member*** of the Governing Body
7.	**Swami Kamalasthananda**	Principal of Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, Rahara	***Member*** of the Governing Body
8.	**Swami Muralidharananda**	Headmaster of Ramakrishna Mission Boys' Home High School, Rahara	***Member*** of the Governing Body
9.	**Swami Vedanuragananda**	Controller of Examinations of Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, Rahara	***Member*** of the Governing Body
10	**Sri Miltan Biswas**	Assistant Professor of Ramakrishna Mission Brahmananda College of Education, Rahara	***Member*** of the Governing Body (Teacher Representative)

Our Faculties

HOI : **Swami Nirishananda**	**Principal (Actg.)**
TEACHERS : **Dr. Kousik Chattopadhyay**	M.A. (Bengali), P.G.B.T., M.Ed., Ph.D. - **Associate Professor**
Dr. Malayendu Dinda	M.A. (English), D.E.L.T., P.G.C.T.E. & P.G.D.T.E., M.Ed., M.Phil., Ph.D. - **Associate Professor**
Dr. Sanjoy Mitra	M.P.Ed., Ph.D., D.N.H.E., D.Y.E. - **Assistant Professor**
Dr. Prosenjit Mandal	M.Sc. (Zoology), M.A. (Education), M.Ed., M.Phil. (Education), Ph.D. **- Assistant Professor**
Dr. Subrata Biswas	M.Sc. (Physics), P.G.D.G.P.C. & F.T., P.G.D.H.R. & D.E., M.A. (Education), M.Ed., Ph.D. - **Assistant Professor**
Prof. Miltan Biswas	M.Sc. (Geography), Certificate Course in Remote Sensing & GIS, M.Ed., M. Phil. (Geography) - **Assistant Professor**
Prof. Abdus Safi	M.Sc. (Mathematics), M.Ed. - **Assistant Professor**
Dr. Samrat Bisai	M.A. (English), M.Ed., Ph.D. - **Assistant Professor**
Dr. Tusher Kanti Halder	M.A. (English), M.A. (Education), M.Ed., P.G.D.G.P.C. & F.T., Ph.D. - **Assistant Professor**
Prof. Manorajan Pal	M.A. (History), M.Ed., P.G.D.G.C. - **State Aided College Teacher** (SACT-II)
LIBRARY : **Sri Tapas Biswas**	M.Sc. (Zoology), M.L.I.S., B.T. - **Librarian**
OFFICE : **Sri Abhishek Samanta**	M.Sc. (Mathematics) - **Accountant**
Sri Suvojit Chakraborty	B.Com. (Hons.) - **Clerk**
Sri Sanjay Gharai	**Group-D Staff**
HOSTEL (non-teaching staff) : **Sri Bijoy Krishna Mandal**	

List of B.Ed. Students for the Session : 2024-26

Name : Dipbendu Das
Date of Birth : 22/04/2001
Category : General
Method Subject : Education
Qualification : M.A.
Blood Group : A+
Address : 1/L Gouribari Lane
P.O. - Shyambazar, Dist.- Kolkata,
West Bengal, PIN - 700004
Email Id : dipbendudas9@gmail.com
Contact No. : 9674880886

Name : Tufan Chandra Das
Date of Birth : 07/05/1996
Category : SC
Method Subject : Bengali
Qualification : M.A.
Blood Group : B+
Address :Vill. - Garhjoypur, P.O. - Garhjoypur,
P.S. –Joypur, Dist. - Purulia, West Bengal,
PIN - 723201
Email Id: tufanchandradas@gmail.com
Contact No.: 8927171153

Name : Akash Barua
Date of Birth : 18/07/2003
Category : ST
Method Subject : English
Qualification : B.A.
Address : Kalyan Nagar Barua Para,
Sodepur, P.O. - Natagarh, P.S. -Ghola,
Dist.- North 24 Parganas, W.B.,
PIN - 700113
Email Id : akashbarua122@gmail.com
Contact No. : 7890824778

Name : Faisal Hasan
Date of Birth : 22/07/2002
Category : OBC-A
Method Subject : History
Qualification : B.A.
Blood Group : O+
Address : R-50/1C, Karbala Lane,
Garden Reach, P.O.- Garden Reach,
Kolkata, West Bengal, PIN - 700024
Email Id : iamfaisalh22@gmail.com
Contact No. : 9007140591

Name : Ariful Gazi
Date of Birth : 20/01/2001
Category : OBC-B
Method Subject : Geography
Qualification : M.Sc.
Blood Group : O+
Address : Kalikatala, P.O.- Kalikatala,
P.S. - Jibantala, Dist. - South 24 Parganas,
West Bengal, PIN - 743329
Email Id : arifulgazi032@gmail.com
Contact No. : 6295654874

Name : Subhojit Raut
Date of Birth : 14/07/1996
Category : General
Method Subject : Mathematics
Qualification : M.Sc. , Blood Group : A+
Address : Dakshin Paschimpara,
Dakshin Chandanpiri, P.O. Chandanpiri,
Dist.- South 24 Parganas, West Bengal,
PIN - 743357
Email Id : subhojitraut96@gmail.com
Contact No. : 7439764660

Name : Md Zafaryaab Alam
Date of Birth : 28/09/2000
Category : OBC-A
Method subject : Physical Science
Qualification : M.Sc.
Blood group : B+
Address : 1/2/1 H/6 J.K. Ghosh Road,
Belgachia, P.O. -Belgachia
Kolkata, West Bengal, PIN - 700037
Email Id : dopeheart2809@gmail.com
Contact No. : 7890132867

Name : Md Faizan Azam
Date of Birth : 28/05/1998
Category : OBC-A
Method Subject : English
Qualification : M.A., Blood Group : B–
Address: 1/2, H/15 Jiban Krishna Ghosh
Road,Belgachia, P.O. – Belgachia,
P.S.- Ultadanga, Kolkata, West Bengal,
PIN - 700037
Email Id : faizan1.azam@gmail.com
Contact number : 8583995120

Name:Madhusudan Sing Sardar
Date of Birth :10/02/2001
Category : ST
Method Subject : Bengali
Qualification : B.A., Blood group : O+
Address :Vill-ChhotoUrma, P.O. - Bara Urma,
P.S. – Balarampur, Dist. - Purulia, West Bengal,
PIN - 723153
Email Id : madhusudansingsardar6@gmail.com
Contact No. : 9883710935

Name : Chayan Maity
Date of Birth : 30/12/2001
Category : General
Method Subject : Life Science
Qualification : M.Sc. , Blood Group : B+
Address : Khansaheb Abad, Sagar, P.O.-
Khansaheb Abad, Dist.- South 24 Parganas,
West Bengal, PIN - 743373
Email Id : maity2001chayan@gmail.com
Contact No. : 9832377339

List of B.Ed. Students for the Session : 2024-26

Name : Debasish Sarkar
Date of Birth : 19/08/2000
Category : SC
Method Subject : Education
Qualification : M.A., Blood Group : O+
Address : Vill- Delwarpur, P.O. -Fatepur Hat,P.S. – Kaliaganj. Dist. -Uttar Dinajpur, West Bengal, PIN - 733132
Email Id : debasishsarkar28187@gmail.com
Contact No. : 9679683209

Name : Shoaib Mondal
Date of Birth : 08/04/2000
Category : General
Method Subject : English
Qualification : M.A., Blood Group : A+
Address : Surendranathpur, Tehatta Block 2, P.O. - Barnia, Dist.- Nadia, West Bengal, PIN - 741156
Email Id : shoaibmondal982@gmail.com
Contact No. : 6295483042

Name : Dulal Konai
Date of birth : 02/03/1999
Category : SC
Method Subject : Bengali
Qualification : M.A., Blood Group : B+
Address :Vill. - Murshidpara, P.O. - Bon Mohurapur, P.S.- Murarai, Dist. - Birbhum, West Bengal, PIN - 731222
Email Id : dulaldulalkonai02031999@gmail.com
Contact number : 9609725011

Name : Raj Kumar Majumder
Date of Birth : 25/04/2001
Category : General
Method Subject : Geography
Qualification : M.Sc. , Blood Group : O+
Address : Faridkati, P.S. - Gaighata, P.O. - East Bishnupur, Dist. - North 24 Parganas, West Bengal, PIN - 743273
Email Id : rajkumar.tknr@gmail.com
Contact No. : 8388829482

Name : Krishnasish Dasgupta
Date of Birth : 03/03/1989
Category : General
Method Subject : English
Qualification : M.A., Blood Group : B+
Address : P.O.- Sapuipara, Middle Santinagar, Belur, Dist.- Howrah, West Bengal, PIN - 711227
E-mail Id : dasgupta.krishnasish@gmail.com
Contact No : 91233 24139

Name : Bibhu Dutta
Date of Birth : 06/06/1994
Category : OBC-B
Method Subject : Bengali
Qualification : M.A., Blood Group : O+
Address:IchapurMajherpara, P.O. - Santragachi, Dist.- Howrah, West Bengal, PIN - 711104
Email Id : riju.bibhudutta @gmail.com
Contact No. : 9804877183

Name : Sk Ashadu Zzaman
Date of Birth : 15/06/1999
Category : OBC-A
Method Subject : English
Qualification : M.A., Blood Group : AB+
Address : Eastern Residency, 228 SN Banerjee Road, Monirampur, P.O.- Barrackpore, Dist.- North 24 Parganas, West Bengal, PIN - 700120
Email Id : ashaduisme@gmail.com
Contact No.: 9674460074

Name : Pritam Saha
Date of Birth : 13/10/2001
Category : General
Method Subject : History
Qualification : M.A., Blood Group : AB+
Address : Vill. - Nandigram, P.O. - BipraNandigram, Dist. - Birbhum, West Bengal, PIN - 731219
Email Id : pritamsaha731219@gmail.com
Contact No. : 9064052903

Name : Debottam Das
Date of Birth : 28/07/2001
Category : General, Method Subject : History
Qualification : M.A. , Blood Group : B+
Address : South-side of P.K. College Ground, Jalalkhanbar, Contai, P.O. - Contai, Dist.- PurbaMedinipur, West Bengal, PIN - 721401
Email Id : debottamdas540@gmail.com
Contact No. : 9883497769

Name : Sumit Kumar Das
Date of Birth : 24/08/2000
Category : SC
Method Subject : Bengali
Qualification : M.A., Blood Group : A+
Address : Mohispota, P.O.- Natagarh, Dist.- North 24 Parganas, West Bengal, PIN - 700113
Email Id : sumitkumardas24aug@gmail.com
Contact number : 6290784324

List of B.Ed. Students for the Session : 2024-26

Name : Sumit Mandi
Date of Birth : 03/11/1999
Category : ST
Method Subject : English
Qualification : B.A., Blood Group : O+
Address: Vill. –Belui, P.O. –Paharhati, P.S. –Memari,Dist. -PurbaBardhaman, PIN - 713168
Email Id : mandisumit123@gmail.com
Contact number : 6295863743

Name : Irfan Ahmad
Date of Birth : 18/04/2001
Category : OBC-A
Method Subject : Education
Qualification : B.A., Blood Group : O+
Address : R 140/1 S A Farooque Road, Garden Reach,P.O. - Garden Reach, Dist. - Kolkata, West Bengal, PIN - 700024
Email Id : irfanah715@gmail.con
Contact No. : 8274099661

Name : Aniket Debnath
Date of Birth : 10/11/2000
Category : OBC-B
Method Subject : Physical Science
Qualification : M.Sc. , Blood Group : AB+
Address : 14Q Mahendra Roy Lane, P.O. - GobindaKhatick Road, Dist. - Kolkata, West Bengal, PIN - 700046
Email Id : aniketdebnath1011@gmail.com
Contact No. : 7980999460

Name : Surajit Saha
Date of Birth : 06/09/2001
Category : SC
Method Subject : Geography
Qualification : M.Sc. , Blood Group : AB+
Address : Begumganj, Jiaganj, P.O. – Jiaganj, Dist. - Murshidabad, West Bengal, PIN - 742123
Email Id : 7430894930surajit@gmail.com
Contact No. : 7430894930

Name : Suresh Mondal
Date of Birth : 05/09/2001
Category : General
Method Subject : History
Qualification : M.A. , Blood Group : B+
Address : Vill. - Anandapur, P.O. - Khasbarh, P.S - Ghatal, Dist. - PaschimMedinipur, West Bengal, PIN - 721212
Email Id : sureshmondal20010@gmail.com
Contact No. : 8509375825

Name : Dhiraj Sen
Date of Birth : 02/04/2003
Category : OBC-B
Method Subject : Life Science
Qualification : B.Sc., Blood Group : A+
Address : Vill. - Paharpur, P.O. - Siakulberia, P.S. -Salanpur, Dist. - PaschimBardhaman, West Bengal, PIN - 713335
Email Id : dhirajsn18@gmail.com
Contact No. : 9907573114

Name : Rajkumar Mondol
Date of Birth : 04/01/1999
Category : SC
Subject : History
Qualification : M.A., Blood Group : B+
Address:Vill. - Hatamari, P.O. - Joyramkhali, P.S. - Canning, Dist. - South 24 Parganas, West Bengal, PIN - 743329
Email Id : mondolrajkumar85@gmail.com
Contact No. : 7029221480

Name : Gairik Misra
Date of Birth : 08/07/1999
Category : General
Method Subject : English
Qualification : B.A., Blood Group : O+
Address:Bazrapara, Jalpaiguri, P.O. - Denguajhar, P.S. - Kothwali, Dist. - Jalpaiguri, West Bengal, PIN - 735121
Email Id. : Misra.gairik123@gmail.com
Contact No. : 9832981201

Name : Ananta Das
Date of Birth : 16/07/2001
Category : General
Method Subject : Bengali
Qualification : M.A., Blood Group : O+
Address : Vill. - Alaipur, P.O. - Amtala, P.S.– Farakka, Dist. - Murshidabad, West Bengal,PIN - 742202
Email Id : dasananta7779@gmail.com
Contact No. : 6295901246.

Name : Sudip Karmakar
Date of Birth : 29/12/2000
Category : OBC-B
Subject : History
Qualification : M.A. , Blood Group : A+
Address : Vill. - Panapukur, P.O. -Bhangar, P.S.–Kashipur, Dist. - South 24 parganas, West Bengal, PIN- 743502
Email Id : sudipksh19428@gmail.com
Contact No. : 6297328964

List of B.Ed. Students for the Session : 2024-26

Name : Arijit Pandey
Date of Birth : 11/12/1999
Category : General
Method Subject : Bengali
Qualification : B.A., Blood Group : B+
Address : 95/C, H.K Sarkar Road,Koleypara, P.O - Talpukur, Barrackpore, Kolkata - 700123, West Bengal
Email Id : pandeyarijit6@gmail.com
Contact No. : 8777322155

Name : Atique Ejaz
Date of Birth : 20/09/2001
Category : OBC-A
Method Subject : English
Qualification : B.A., Blood Group : O-
Address: 11/A/11/A, P.K. Das Lane, P.O. - Rishra, P.S. - Serampore, Dist. - Hooghly, West Bengal, PIN - 712248
Email Id : ejazatique0273@gmail.com
Contact No. : 9681392053

Name : Amalendu Naskar
Date of Birth : 21/09/2000
Category : SC
Method Subject : Geography
Qualification : B.A.
Address : Vill. & P.O.- Dongajora, P.S. - Kultali, Dist. - South 24 Parganas, West Bengal, Pin- 743329
Email Id : amalnaskar671@gmail.com
Contact No. : 9382800944

Name : Sabyasachi Sharma
Date of Birth : 18/06/2001
Category : General
Method Subject : Geography
Qualification : M.Sc. , Blood Group : B+
Address: 20/1 Banerjee Para Road, PushpanjaliAppartment, Shyamnagar, North 24 Parganas, West Bengal, PIN - 743127
Email Id : Sabyasachi18sharma61@gmail.com
Contact No. : 9903893873

Name : Rahul Das
Date of Birth : 27/04/2001
Category : SC, Method Subject : Education
Qualification : M.A., Blood Group : O+
Address : Dr. Lal Mohan Banerjee Road, Panihati, Angles Nagar, P.O. -Panihati, Dist. - North 24 Parganas, West Bengal, PIN - 700114
Email Id : rahuldas27042001@gmail.com
Contact No. : 9062885191

Name : Soumyajit Mandal
Date of Birth : 26/08/2001
Category : General
Method Subject : Education
Qualification : M.A., Blood Group : A+
Address : Vill. - Tagra, P.O. - Ramnagar, P.S. - Tarakeswar, Dist. - Hooghly, West Bengal, PIN - 712410
Email Id : soumyajitmandaltagra@gmail.com
Contact No. : 7479148182

Name : Raktim Pal
Date of Birth : 19/11/2003
Category : General
Method Subject : Life Science
Qualification : B.Sc., Blood Group : O+
Address : 44, B Block, H B Town, Ghola, Sodpur, P.O. - Sodepur, P.S. –Ghola, Dist. - North 24 Parganas, West Bengal PIN - 700110
Email ID : raktimcbi861@gmail.com
Contact No. : 9477347740

Name : Soumitra Mondal
Date of Birth : 11/05/2000
Category : SC, Method Subject : History
Qualification : M.A. , Blood Group : B+
Address : Vill. - Chilatala, P.O. - B.Raghunathpur, P.S : Kashipur, Dist - South 24 Parganas, West Bengal, PIN- 743502
Email Id : ss77mondal@gmail.com
Contact No. : 7407871857

Name : Rohan Das
Date of Birth : 29/01/2001
Category : SC
Method Subject : History
Qualification : M.A., Blood Group : O+
Address : Vill.-Biprodaspur, P.O. -Paulpur, P.S. -Gosaba, Dist. - South 24 Parganas, West Bengal, PIN - 743611
Email Id : das888313@gmail.com
Contact Number : 8768589008

Name : Somenath Mukherjee
Date of Birth : 19/01/1998,Category : General
Method Subject : Physical Science
Qualification : M.Sc., Blood Group : O–
Address : Vill. - Malancha, P.O. - MalanchaMahinagar, P.S. - Sonarpur, Dist. - South 24 Parganas, West Bengal, PIN - 700145
Email Id : mukherjeesomenath23@gmail.com
Contact No. : 9433834051

List of B.Ed. Students for the Session : 2024-26

Name : Md Masihur Rahman Ansari
Date of Birth : 25/03/2001
Category : OBC-A
Method Subject : English
Qualification : B.A.
Address : 106/1,Mahatma Gandhi Road, P.O. -Barabazar, P.S. -Jorasanko, Dist. - Kolkata, West Bengal, PIN - 700007
Email Id : taubahtalks@gmail.com
Contact No. : 8276912234

Name : Ranjit Biswas
Date of Birth : 28/08/2000
Category : SC, Method Subject : History
Qualification : M.A. Blood Group : B+
Address : Salua 3 No. Govt. Colony, P.S. - Habra, Dist. - North 24 Parganas, West Bengal, PIN - 743263
Email Id : ranjitbiswas8439@gmail.com ranjitbiswas8439@gmail.com
Contact No. : 7585833507

Name : Zulkernain Samad Siddiquie
Date of Birth : 03/11/2002
Category : General
Method Subject : Education
Qualification : B.A.
Address : Gulzar Bagh Makalhati, P.O. -Bidhangarh, P.S. -Rabindranagar, Dist. - South 24 Parganas, West Bengal, PIN - 700066
Email Id : zulkernainsamadsiddiquie@gmail.com
Contact No. : 6291862047

Name : Prasanta Pule
Date of Birth : 18/11/2001
Category : SC
Method Subject : History
Qualification : B.A., Blood Group : B+
Address : Vill. &P.O. - Dakshin Durgapur, P.S. - Kultali, Dist. - South 24 Parganas, West Bengal, PIN - 743349
Email Id : prasantapule771@gmail.com
Contact No : 9883968622

Name : Monotosh Mistry
Date of Birth : 26/04/2002
Category : SC
Method Subject : Education
Qualification : M.A., Blood Group : A+
Address : Vill. - Subhash Nagar, P.O. - Rabindra Nagar, P.S. - Chinsurah, Dist. - Hooghly, West Bengal, PIN - 712103
Email Id : monotosh712103@gmail.com
Contact No. : 6290739002

Name : Gourab Chakraborty
Date of Birth : 27/11/2002, Category : General
Method Subject : Bengali
Qualification : B.A., Blood Group : B+
Address : Berhampore, Goaljan, Budharpara, P.O. - Goaljan, P.S. -Berhampore, Dist. -Murshidabad, West Bengal, PIN- 742188
Email Id : gourabchakraborty4545@gmail.com
Contact No. : 8001483134

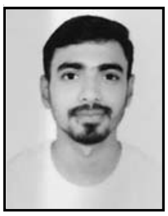

Name : Dipu Mondal
Date of Birth : 02/12/2001
Category : SC
Method Subject : History
Qualification : B.A. Blood Group : B+
Address : Vill. & P.O. –Buinch Bati, P.S. -Bakultala, Dist. - South 24 Parganas, West Bengal, PIN - 743338
Email Id : mdipu0605@gmail.com
Contact No. : 8017362348

Name : Musaraf Ali
Date of Birth : 04/04/1994
Category : General
Method Subject : Education
Qualification : Ph.D., Blood Group : AB+
Address :Vill. - Naksa, P.O. - Talandu, P.S. - Mogra, Dist. - Hooghly, West Bengal, PIN - 712148
Email Id : musarafali.edu@gmail.com
Contact No. : 6290439210

Name : Arobindo Naha
Date of Birth : 13/08/1999
Category : General
Method Subject : Education
Qualification : M.A., Blood Group : O+
Address : Patana Ambika Nagar, P.O. - Nimta Dist. - North 24 Parganas, West Bengal, PIN - 700049
Email Id : arobindonaha@gmail.com
Contact No. : 6289825233

Ramakrishna Mission Brahmananda College of Education, P.O.- Rahara, Kolkata-700118

RAMAKRISHNA MISSION
BRAHMANANDA COLLEGE OF EDUCATION
NSS UNIT
NATIONAL SERVICE SCHEME
(NSS)
Rahara, Kolkata – 700118, West Bengal, India

Ramakrishna Mission
Brahmananda College of Education
BLOOD DONATION CAMP
Annexe Building

"চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি — কর্মের, কমল — ভক্তির, উদীয়মান সূর্যটি — জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি — যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনী শক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংস প্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান — যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয় — চিত্রের ইহাই অর্থ।"

— স্বামী বিবেকানন্দ